ঠিক সেইখানে এবং সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁদেরই মুখের ওপর। এবার সবাই চাইলো সেই লোকটির দিকে। আশ্চর্য্য হয়েছিল সবাই, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলতে পারলে না।

লোকটি বলতে লাগল, আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বক্তা নই, বক্তৃতা দেওয়া আমার পেশাও নয়। কিন্তু জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর চুনীলাল চৌধুরী মশায়ের আগমন উপলক্ষে আপনাদের সমবেত ব্যাকুল উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে নিজেকে যেন বরদাস্ত করতে পারলাম না। আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমার কণ্ঠও হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। আমার মনে হয় রায়বাহাদুরের নাম উল্লেখেই আপনাদের কণ্ঠ যেমন গদগদ হয়ে উঠেচে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। শুনতে পেলাম ভূষণা তাঁর নিজের পৈতৃক বাসভূমি। জলকষ্টে কয়েক বৎসর এ-গ্রামের দুর্গতির সীমা নেই। সামান্য দুটি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আজ দু'বছর তাঁর দপ্তরে আবদ্ধ হয়ে আছে—

ব্যাপারটা যে ঠিক কোন্ দিকে গড়াচ্ছে তা বোধহয় সভায় উপস্থিত কেহই ঠিক অনুমান করতে পারছিলেন না; তাঁরা সবাই আশ্চর্য্য হয়ে লোকটির মুখের দিকে চেয়েছিলেন। এদিকে ওদিকে শুধু চাপা গুঞ্জন উঠছিল। কিন্তু সুমিত্রা আর চুপ করে থাকতে পারল না; হীরালালের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো, কেন আপনারা ওঁকে দাঁড়াতে দিলেন, কে এই অভদ্র লোকটা।

হীরালাল জবাব দিল, শিশির রায়, আমাদের চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর নতুন ডাক্তার। তিন মাস গ্রামে আসা অবধি আমাদের হাড় মাস জ্বালিয়ে খাচ্চে।

কিন্তু ওঁকে আপনারা কথা কইতে দিচ্চেন কেন? সুমিত্রা বলে ওঠে—বার করে দিন ওঁকে এখান থেকে। রায়বাহাদুরও একটু বিব্রত বো

করছিলেন, কিন্তু সে ভাবটা গোপন রেখে তিনি বল্লেন, থাক না মা, দেখাই যাক না, ওর কি বলবার আছে।

সুমিত্রা কিন্তু নারাজ। প্রবল আপত্তি জানিয়ে সে বল্লে, না বাবা, তোমার নিজের গ্রামে তোমার এই অপমান আমি কিছুতেই হতে দেব না।

হীরালাল এবং বোর্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের মুখের দিকে চেয়ে সে বলতে লাগল, আপনারা এখনও চুপ করে রয়েছেন? এই [illegible] জন্যেই কি বাবাকে আপনারা ঘটা করে গ্রামে ডেকে এনেছিলেন? এই শিশিরবাবুই তা হলে গ্রামের কর্তা, আপনারা [illegible]

হীরালালের পক্ষে এরপর চুপ করে থাকা অসম্ভব। শিশির ডাক্তারের দিকে একটু এগিয়ে সে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল, নেমে যান আপনি এখান থেকে, নেমে যান। আপনাকে কেউ বক্তৃতা দিতে ডাকেনি, আর আপনার প্রলাপ কেউ শুনতেও যায় না।

হীরালালের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সভার আরও দু' চার জন বলে উঠল—নেমে যান, বেরিয়ে যান। শিশির কিন্তু বিব্রত না হয়ে বেশ সপ্রতিভভাবেই বলতে লাগল, মনে হচ্ছে, আমার বক্তৃতায় আপনারা বড় বেশী বিচলিত হয়েছেন এবং সেইটুকুই আমার আনন্দ। আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই। এই সভায় নির্লজ্জ চাটুকারিতায় যে ফানুস আপনারা ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন তা' যদি আমার বিদ্রূপে একটুখানি ফুটো হয়ে থাকে, তা' হলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না।

রায়বাহাদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, চলো মা।

হীরালালের মাথায় যেন বাজ পড়লো। বিচলিত, বিব্রতকণ্ঠে সে

রায়বাহাদুরের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, কিছু ভাববেন না, এসব ছেলে ছোকরাদের বাঁদরামী। এখুনি আমি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

রায়বাহাদুর বোধহয় হীরালালের ওপর খুব বেশী নির্ভর করতে পারলেন না, বললেন—কিছু মনে করো না হীরালাল, আমি আর এখানে থাকতে পারচি না।

সুমিত্রাও হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, এর পরও আপনারা বাবাকে এখানে থাকতে বলেন ?

হীরালাল কি করবে ঠিক করতে পারে না, বলে—সব নষ্টের মূল ওই ডাক্তার, ও যে সভায় এসে এমন শয়তানি করবার সাহস করবে তা আমি ভাবতে পারিনি।

রায়বাহাদুর বল্লেন, এ-সব কথা এখন থাক হীরালাল। যদি এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করবার থাকে, সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে যেতে পার।

হীরালাল বলে, আজ্ঞে যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব। ওই শিশির ডাক্তারকে টিট করার একটা ব্যবস্থা যদি না করতে পারি, তা' হলে আমাদের গাঁয়ে বাস করাই উচিত নয়।

সুমিত্রা বলে, শিশির ডাক্তারকে তো আপনারাই এনেছিলেন গ্রামে।

কথাটা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না কাজেই তাকে বলতে হ'ল, তখন কি জানি ওই কেঁচো একদিন ফণা তুলে দাঁড়াবে। এমন বেয়াড়া ডাক্তার কখনও দেখিনি।

রায়বাহাদুর বললেন, তোমার সভা তুমি সামলাও হীরালাল, আমরা চলি। মেয়ের হাত ধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই হীরালাল রায়বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। উমেশ চৌধুরী বাড়ীর পুরান সরকার। হীরালাল প্রথমেই তাকে

দলে টানলে এবং বুঝিয়ে দিলে যে, এ-অপমানের শোধ নিতে না পারলে গ্রামে চৌধুরীদের মান মর্য্যাদা আর কিছুই থাকবে না। উমেশকে উত্তেজিত করবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এরপরেই সে উমেশকে সঙ্গে নিয়ে চুণীলালের ঘরে এসে দাঁড়াল।

উমেশ রায়বাহাদুরের সামনে গিয়ে বললে, এ-অপমান আমরা চুপ করে সহ্য করতে পারব না হুজুর!

চুণীলাল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি পারবেন তা' হ'লে?

উমেশ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো, আপনি হুকুম দিলে আজ রাত্রেই ওর মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে আসবার মত লোকের অভাব হবে না।

রায়বাহাদুর এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে হুকুম আমি দেব কেন?

হীরালাল বলে উঠল, নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি জান উমেশ, মাথা ফাটাবার মত সোজা ব্যাপার হলে আমাদের আর মাথা খাটাতে হ'তো না। রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে সে বলে চললো,—কিন্তু লোকটা সত্যি আমাদের জ্বালাতন করে তুলেচে স্যার। যেদিন থেকে গাঁয়ে ঢুকেচে, সেদিন থেকে গাঁয়ে আর শান্তি নেই।

সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল রায়বাহাদুরের পাশেই। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের ওপর শিশির ডাক্তারের এত আক্রোশই বা কেন? কি নিয়ে আপনাদের শত্রুতা?

হীরালাল বললে, শত্রুতা, শুধু হিংসের! উনি কোথাকার কে? দুদিনের জন্যে চাকরী করতে এসে উনি গাঁয়ের ওপর মোড়লী করতে চান। আমরা এই গাঁয়ের মাটিতে এত বড় হলাম, আমাদের চেয়ে গাঁয়ের উপর ওঁর দরদ বেশী! সেই দরদ দেখিয়ে উনি আমাদের হটিয়ে দিতে চান।

সুমিত্রা বললে, আপনারাও তো হটেই যাচ্ছেন দেখচি। নইলে আজ উনি আপনাদের সভায় অমন সব কথা বলতে সাহস করেন?

হ্যাঁ, সাহস এইবার বা'র করচি—হীরালাল বললে, একটি রিপোর্টে আমি ওর চাকরী খেয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে মনের জ্বালা মিটবে না। ওকে রীতিমত জব্দ করে বিদায় করা চাই। এমন ঘা দিতে হবে, যার দাগ সারা জীবনে মিলাবে না।

রায়বাহাদুর চুপ করে বসেছিলেন। তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই সুমিত্রা বলে উঠলো, কি হ'লো বাবা? সেই ব্যথাটা কি আবার—?

রায়বাহাদুর কোন রকমে বলতে পারলেন, হ্যাঁ মা, হঠাৎ আবার বুকের কাছটায় চাড়া দিয়ে উঠচে।

তাঁর মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, একটু দম নিয়ে হীরালালের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আজ আপনারা যান। কাল সকালে যা হয় একটা স্থির করা যাবে।

এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় রীতিমত মনক্ষুণ্ণ হলেও হীরালাল বলল, আজ্ঞে তাই হবে। কিন্তু এ-রকম ব্যথায় একজন ডাক্তার ডাকলে হোত না?

ডাক্তার বলতে তো তোমাদের ওই শিশির ডাক্তার! একটু চুপ করে থেকে রায়বাহাদুর বললেন, কোন দরকার নেই হীরালালবাবু। একটু ঘুমুতে পারলেই সব-ঠিক হয়ে যাবে।

হীরালাল চলে যাবার পর রায়বাহাদুর ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। ঘরের প্রকাণ্ড দেয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও রায়বাহাদুর ঘুমোতে পারলেন না, ব্যথাটা যেন ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগলো। সুমিত্রা সমস্তক্ষণ তাঁর মাথার শিয়রে

দাঁড়িয়েছিল। এক সময় সে জিজ্ঞাসা করলে, শহর থেকে ডাক্তার ডাকলে ভাল হ'ত না, বাবা?

—না, না, তাতে কোন লাভ নেই। শহর থেকে ডাক্তার পাঁচ ছ' ঘণ্টার আগে আনা যাবে না। তার চেয়ে আমায় ঘুমের ওষুধটা দে। ঘুমোতে পারলেই সেরে যাবে।

রায়বাহাদুর যেখানেই যান, ঘুমের ওষুধটা সঙ্গে রাখতেন। স্নমিত্রা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এল।

ওষুধ খেয়ে রায়বাহাদুর বললেন, অত ভয় পাচ্ছিস কেন মা! এত আজকের ব্যথা নয়। মাঝে মাঝে এমন হয়, আবার সেরে যায়।

—কিন্তু সেবারের মত যদি বাড়াবাড়ি হয়? স্নমিত্রা একটু বিচলিত-ভাবে বলতে লাগলো।—কেন বাবা তুমি আজ গ্রামে থাকতে রাজী হলে? এ-অপমানের পর আমাদের এখানে থাকা মোটেই উচিৎ হয়নি।

রায়বাহাদুর ম্লান হেসে বললেন, কিন্তু এ যে আমাদের নিজেদের গ্রাম! এখানে অপমানিত হয়ে চলে গেলে লজ্জা যে আমাদেরই।

তা' হলে যারা এ গ্রামে তোমায় অপমান করবার সাহস করেচে, তাদের তুমি উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করো। তুমি জান না বাবা, রাগে আমার সমস্ত শরীর কি করচে?

কথা বলতে বলতে রায়বাহাদুরের মুখের ওপর চোখ পড়তেই সে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি সে বললে, না বাবা, আমার এ-সব কথা বলা অন্যায় হয়েচে। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো। চাদরটা রায়বাহাদুরের বুক পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে স্নমিত্রা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে এসে স্নমিত্রা ক্লান্তভাবে বসে পড়লো। মোটরে কলকাতা থেকে এতদূর আসা, সভার হট্টগোল···সমস্তদিনে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম

করবার অবকাশ তার ঘটে নি! কিন্তু শরীরের অসহ্য ক্লান্তির মধ্যেও শিশির ডাক্তারের সেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মাখানো কথাগুলো সে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, গেঁয়ো ডাক্তারের ধৃষ্টতার একটা সমুচিত উত্তর দিতে না পারলে; সে যেন কিছুতেই স্থির হতে পারবে না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো প্ল্যানও তার ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু হঠাৎ রায়বাহাদুরের বুকের ব্যথাটা বেড়ে ওঠায়, সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে কোনরকমে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলে সে বাঁচে! চেয়ারে বসে বসেই সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঝিয়ের ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

'দিদিমণি, দিদিমণি।'

সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। শোনা গেল পাশের ঘর থেকে ঝি বলচে, শিগগির আসুন দিদিমণি, বাবুর খুব কষ্ট হচ্ছে।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি রায়বাহাদুরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সরকার মশাই থেকে বাড়ীর অনেকেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। রায়বাহাদুর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছিলেন। সুমিত্রা তাঁর কাছে গিয়ে বললে, আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাই বাবা।

ঝি বললে, শিশির ডাক্তারকে ডেকে আনবো দিদিমণি?

রায়বাহাদুর ক্লান্তকণ্ঠে বললেন,—না, না, কোন ডাক্তারের দরকার নেই। আমায় একটু জল দে।

সুমিত্রা তাঁকে জল খাইয়ে সরকার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কাছাকাছি আর কোন ডাক্তার নেই সরকার মশাই?

—না দিদিমণি, দু-কোশ দূরে হীরাচড়ে বুড়ো কবরেজ মশাই আছেন। কিন্তু রাত্রে তিনি আসতে পারবেন না।

রায়বাহাদুর সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আর কোন

ডাক্তার বোধহয় দরকার হবে না, মা। গাঁয়ের মাটিতে বোধহয় এই জন্যই ডাক পড়েছিল।

সুমিত্রার দুই চোখ জলে ভরে গেল। সে বলে উঠল, না বাবা, অমন কথা বলো না। উমেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললে, যান সরকার মশাই, আপনাদের চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর ডাক্তারকেই ডেকে আনুন। রাত্রে আসতে যদি আপত্তি করেন, বলবেন যত টাকা চান তাই দেওয়া হবে।

সরকার বললেন, শিশির ডাক্তার সে রকম লোক নয়। রুগীর ডাক পড়লে রাতবিরেত মানে না, আবার টাকার পরোয়াও করে না।

সুমিত্রা তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি তাড়াতাড়ি যান দেখি।—সরকার মশাই যাবার জন্য পা বাড়ালেন। রায়বাহাদুর শিশির ডাক্তারের সাহায্য নেওয়ার কথাটা ঠিক পরিপাক করতে পারছিলেন না, বললেন: এ-রকম ডাক্তার কি না ডাকলে হ'ত না মা? একটা হাতুড়ে গোঁয়ারের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে আমার অমনি মরা ভাল ছিল। সরকার মশাইকে মানা কর।

সুমিত্রা কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছিল। সে বললে, না বাবা, এ সময় তোমার কোন আপত্তি শুনবো না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই শিশির ডাক্তার সরকার মশাইয়ের সঙ্গে চৌধুরী বাড়ীতে হাজির হ'ল। যথারীতি রায়বাহাদুরকে পরীক্ষা করবার পর শিশির জিজ্ঞাসা করলে, এ-রকম ব্যথা আগে আপনার হয়েছিল?

রায়বাহাদুর চুপ করে পড়ে রইলেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোন

জবাব পাওয়া গেল না। শিশির একটু বিরক্তভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলে, এই সোজা কথাটার উত্তর দিতে পারচেন না? এর আগে কবে এ-রকম ব্যথা হয়েছিল?

রায়বাহাদুরের বদলে জবাব দিল সুমিত্রা,—প্রায় দু'মাস আগে।

শিশির একটু ভেবে নিয়ে বললে, এর আগেও নিশ্চয় কয়েকবার এই রকম ব্যথা হয়েচে?

সুমিত্রা জানায়, হ্যাঁ, বছরখানেক আগে প্রথম আরম্ভ হয়। তখন মাস দুয়েকের মধ্যে বার দুই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, এত কথা ত আপনার জানবার দরকার নেই। যদি পারেন ত এখনকার মত এ যন্ত্রণা কমাবার ব্যবস্থা করুন। না পারেন ছেড়ে দিন।

—চিকিৎসা ব্যাপারটা জেলাবোর্ড চালানর মত সোজা ব্যাপার নয় রায়বাহাদুর। যেমন তেমন করে জোড়া তালি দিয়ে চিকিৎসা হয় না। একটু থেমে শিশির আবার বললো, যন্ত্রণা কমলেই আপনার রোগ সারবে না। তার জন্যে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা দরকার।

—সে ব্যবস্থা আমি কাল শহরে গিয়েই করবো। এখন আমার এ যন্ত্রণা কমান যাবে কি না।

—তা যাবে। কিন্তু কাল আপনার শহরে যাওয়া হবে না।

রায়বাহাদুর রেগে উঠলেন। বললেন, অসম্ভব। কাল আমায় শহরে যেতেই হবে; অত্যন্ত জরুরী মিটিং।

—মিটিং যত জরুরী হোক, কাল কেন, এখন পনর দিন আপনার কোন রকম নড়াচড়া চলবে না। এখানেই বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

রায়বাহাদুর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, পনর দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে? পনর দিন! তোমার মত হেতুড়ে

গেঁয়ো ডাক্তারের কথায় আমি বিশ্বাস করি মনে করেছ। কি জান তুমি ?

শিশির একটু হেসে বললে, অত উত্তেজিত হবেন না, আপনার অসুখ তো তাতে বাড়বেই। যন্ত্রণাটা হয়তো আর কমান যাবে না।

ব্যাগ খুলে কয়েকটা বড়ি বার করে শিশির সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, আপাততঃ যন্ত্রণা কমাবার জন্য এই বড়ি দিয়ে যাচ্ছি। এখুনি একটা খাইয়ে দেবেন। আর দু-ঘণ্টার মধ্যে ঘুম না হোলে আর একটা দেবেন। ঘুমের পর সকালে এই প্রেসক্রিপশান মত ওষুধ চলবে। শিশির ডাক্তার প্রেসক্রিপশান লেখায় মন দিল।

রায়বাহাদুর বললেন, রেখে দাও তোমার সকালের প্রেসক্রিপশান। আমি কাল সভায় যাবই।

শিশির বললে, সে সভা তা হলে আপনার শোকসভা হবে।

রায়বাহাদুর আরও রেগে উঠলেন। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এমনি বিশ্রী হয়ে দাঁড়ালো যে শিশির আর সেখানে বসে সময় নষ্ট করার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলে না। ব্যাগটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বারান্দায় পৌঁছেই শিশির দেখল, সুমিত্রাও এই দিকেই আসচে। সুমিত্রা শিশিরের কাছে এসে কোন কথা না বলেই শিশিরের হাতে দশ টাকার একখানা নোট দিতে গেল।

শিশির কিন্তু নোটখানা নিলে না। বললে, অত্যন্ত দুঃখিত। চেঞ্জ আমি সঙ্গে আনিনি।

চেঞ্জ দরকার নাই। রাত্রের কল হিসাবে সবটাই আপনার ভিজিট।

আপনাদের উদারতায় খুসী হলাম। কিন্তু আপনারা বড়লোক বলেই বেশী ভিজিট নিয়ে আপনাদের বেশী খাতির দেখান আমার পক্ষে

সম্ভব নয়। আমার ভিজিট দিনে রাত্রে সকল সময়েই এখানে দু-টাকা। তাও আবার যে দিতে পারে সে দেয়। আপনারা দিতে পারেন, সুতরাং দু-টাকাই আপনাদের কাছ থেকে নেব। এখন খুচরো না থাকে পরে প্রেসক্রিপশানের সঙ্গে ডিসপেন্সারীতে পাঠিয়ে দেবেন।

সুমিত্রার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল, কি একটা শক্ত কথা সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সুমিত্রা!

যাই বাবা, বলে সুমিত্রা ফিরে দাঁড়াল। শিশিরও নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

ভিতর থেকে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল—আমি ওই হাতুড়ে বদমায়েস ডাক্তারের কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি এখুনি শহরে গাড়ী পাঠাও ডাক্তার ঘোষকে ডাকতে।

ঘরের ভেতরে পৌঁছে সুমিত্রা বললে, তা পাঠাচ্ছি বাবা, কিন্তু এই বড়িটা তুমি আপাততঃ খেয়ে নাও।

না, ওর কোন বড়ি খেতে চাই না।

না বাবা খেয়ে নাও। শহরের ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত এতে যন্ত্রণা কম হ'তে পারে।

সরকার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই সুমিত্রা তাকে বললে, যান সরকার মশাই, গাড়ী নিয়ে শহর থেকে ডাক্তার ঘোষকে এখুনি ডেকে নিয়ে আসুন। ডাক্তার ঘোষকে না পান, যে কোন বড় ডাক্তারকে—তিনি যা চান তাই দিয়ে নিয়ে আসবেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন।

সরকার মশাই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

সুমিত্রা চুণীলালের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসলো।

শহরের কোন বড় ডাক্তারই কিন্তু রাত্রিতে আসতে রাজী হলেন

না। ডাক্তার ঘোষ যখন ভূষণায় পৌছলেন তখন পরদিন সকাল আটটা। হীরালাল তার আগেই চৌধুরী [illegible]তে পৌছেছিল। ডাক্তার ঘোষ এসে রায়বাহাদুরের অসুখের ব্যাপারটা জেনে নিয়ে একবার তাঁর বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন। তারপর শিশিরের প্রেস-ক্রিপশানটা দেখতে দেখতে বললেন, ডাক্তার রায় যে বড়িটা দিয়েছিলেন, সেটা খেয়ে তা হলে যন্ত্রণা কম ছিল আর ঘুমও হয়েছিল ?

তা হয়েছিল, সুমিত্রা বলে।

ডাক্তার ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু এই প্রেসক্রিপশানের ওষুধটা আনান হয় নি কেন ?

জবাব দিল হীরালাল। 'হ্যাঁ, আপনিও যেমন! গাঁয়ের এক হাতুড়ে আনাড়ি ডাক্তার নেহাৎ দায়ে পড়ে রাত্রে ডাকতে হয়েছিল। তার প্রেসক্রিপশানের ওষুধ খেতে গেলেই হয়েচে আর কি!

গাঁয়ের ডাক্তারের উপর আপনাদের কোন বিশ্বাস নেই দেখচি। ডাক্তার ঘোষ বলেন।

বিশ্বাস। একটা আনাড়ি হেতুড়ে। রায়বাহাদুর বলে উঠেন।

হীরালাল ফোড়ন দিলে : বিশ্বাস কি করে হবে বলুন! রায়বাহাদুরের আজ শহরে জরুরী মিটিং, না গেলে নয়, আর সে বলে গেল কি না পনর দিন বিছানা থেকে নড়াচড়া চলবে না!

তাই বললেন বুঝি! ডাক্তার ঘোষ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আর সেইজন্যেই তো আপনাকে ডাকা।

ডাক্তার ঘোষ একটু চুপ করে থেকে বলেন, কিন্তু আমার ওপরও তো আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারবেন না।

না, না, সে কি কথা! হীরালাল বলে ওঠে।

বাধ্য হয়েই বলচি। কারণ আমারও মত এই, অন্ততঃ পনর

দিন আপনার বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত! কোন রকম নড়াচড়া হলেই রোগ জটিল হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা।

রায়বাহাদুরের মুখটা ক্রমশঃ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই ডাক্তার ঘোষ বললেন, তা ছাড়া আমি নিজেও এই প্রেসক্রিপশানের চেয়ে অন্য কিছু বিশেষ দিতেও পারচি না। তিনি একটু থামলেন, তারপর প্রেসক্রিপশানটার দিকে চেয়ে বললেন, দেখা হলে আমি তাঁকে এই কঠিন রোগের চমৎকার ডায়গনসিসের জন্য ধন্যবাদ জানাতাম।

বলা বাহুল্য রায়বাহাদুর খুসী হতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, তা হলেও আমি তার হাতে থাকতে রাজী নই। চিকিৎসা যা করবার আপনিই করুন।

ডাক্তার ঘোষ কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন, মাপ কর[illegible] রায় বাহাদুর। চিকিৎসার চেয়ে পয়সাই আমাদের কাছে বড় হয়ে [illegible]ছ সত্যি! তবু আমাদের Professional etiquette—পেশ[illegible] লৌকিকতা বলে একটা জিনিষ আছে। একজন ডাক্তার যখন [illegible] আপনাকে দেখেচেন, তখন তিনি কোন কারণে নেহাৎ অক্ষম না [illegible] অন্য একজন ডাক্তারের পক্ষে আপনার চিকিৎসার ভার নেওয়া অ[illegible]। আপনাকে অন্য ডাক্তার আগে দেখেচেন জানলে তিনি নিজে না [illegible]লে আমি এভাবে আসতে রাজী হতাম না।

টুপীটা মাথায় আঁটতে আঁটতে ডাক্তার ঘোষ বললেন, ভয় পাবেন না, আপনি হাতুড়েশ হাতে পড়েন নি। যিনি আপনার চিকিৎসা করেচেন তাঁকে আমি চিনি না, তবে তিনি যে একজন ডাক্তার এইটুকু আপনাকে জোর করে বলে যেতে পারি।

তিনি হীরালালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রায়বাহাদুর

মুখখানা গম্ভীর করে পাশ ফিরে শুনলেন। সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

হীরালাল কিন্তু ডাক্তার ঘোষকে নীচে পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল।

'বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা এই ডাক্তারের। সহরে যেন আর ডাক্তার নেই।' বলতে বলতে সে রায়বাহাদুরের দিকে চাইল— আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি এখুনি সহর থেকে অন্য ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করচি। টাকা দিলে কোন্ ডাক্তার না আসে একবার দেখবো।

সুমিত্রা কিন্তু হীরালালের এতখানি উৎসাহের আগুণে যেন এক কলসী জল ঢেলে দিল।

—আর কোন ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই হীরালালবাবু। ওঁদের প্রফেসনাল এটিকেট যদি কিছু থাকে তা ভাবতে গিয়ে মিছিমিছি অপমান গায়ে পেতে নিতে আমরা আর চাই না। আপনি শিশির ডাক্তারকেই আর একবার খবর দেবেন।

রায়বাহাদুর বলে ওঠেন,—এখানে কাল রাত্রে আমার আসাই ভুল হয়েচে।

সুমিত্রা বলে, তা যখন হয়েচে তখন আর উপায় কি। তাছাড়া ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের শুধু পয়সা দিয়ে চিকিৎসার সম্পর্ক। আমরা ভিজিট দেব, সে চিকিৎসা করবে। আর কিছু ত ভাববার দরকার নেই।

হীরালাল সায় দিলে—নিশ্চয়, নিশ্চয় তা ছাড়া আর কি? হাজার হোক আমাদের মাইনে করা, চাকর বইতো নয়। কাজও করিয়ে নেব, আবার বিদেয়ও করব সময় হলে। না, না, ও ঠিক আছে। আমি এখুনি গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর প্রেসক্রিপশনটাও নিয়ে যাচ্চি ওষুধ আনতে।

গ্রাম ছোট, ডিস্পেন্সারীও ছোট। আর এই ছোট ডিস্পেন্সারী যে লোকটির অবিশ্রান্ত উৎসাহে এখনও সচল হয়ে আছে, তার নাম হরিহর। হরিহর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।

সেদিন ডিস্পেন্সারীর ছোট বারাণ্ডাটিতে রোগীর ভিড় হয়েছিল একটু বেশী রকম। সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট একটি মেয়ে, নাম পুঁটি। হরিহর অতগুলি রোগী থাকতে ওষুধ তৈরী করে দিল ওই পুঁটির হাতে, আর তাতেই বাধলো গোলযোগ।

রাখালদা গাঁয়ের একজন মাতব্বর লোক। সে বলে উঠল, এ তোমার কি রকম বিচার হরিহর! আমি বলে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি কি না পুঁটি আসতেই ওষুধ দিয়ে দিলে!

হরিহর জবাব দিলে, তাতে হয়েছে কি?

আর একজন বলে উঠল, হয়েছে কি! কেন, আমাদের অসুখটা বুঝি অসুখ নয়!

হরিহর বললে, খুব জরুরী দরকার থাকে, পয়সা ফেল না; তাড়াতাড়ি ওষুধ মিলবে।

রাখালদাস খেঁকিয়ে উঠল—বাঃ পয়সা দেব কেন? সবাই অমনি ওষুধ নিয়ে যাবে, আর আমাদের বেলাতেই পয়সা!

হরিহর একজনের জন্য কয়েকটা পুরিয়া মুড়তে মুড়তে জবাব দিল; অমনি ওষুধ গরীবদের জন্যে, রাখালদাসের মত হাড় কেপ্পন সুদখোর টাকার কুমীরের জন্য নয়। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে, উনি এসেছেন আমা ওষুধ নিতে।

রাখালদাস প্রায় চীৎকার করে বলে, দেখ হরিহর না হয় তুমি

কম্পাণ্ডাই হয়েচে। কিন্তু গালাগালি দিওনা বলে রাখচি। ডাক্তার বাবুকে বলে তোমার চেয়ে ঢের বেশী পাণ্ডাকে কালই আনিয়ে দিতে পারি, জান।

ঠিক সেই সময় শিশির ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার হরিদা? এত ঝগড়া কিসের?

রাখালদাস সোৎসাহে শিশিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগল—শুনুন তো ডাক্তারবাবু, শুনুন আপনার এই কম্পাণ্ডারের কথা। আমায় কিনা গালাগালি দিয়ে বলে, পয়সা দিয়ে ওষুধ নিতে হবে। বড়র বেলায় মায়া আর আমার বেলায় পয়সা। বলে, আমি নাকি টাকার কুমীর।

শিশির হাসতে হাসতে বললে, দাও হরিদা, রাখালবাবুর ওষুধটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। কোন ভাবনা নেই রাখালদা, তোমার ওষুধ ঠিক পাবে।

বিজয়গর্ব্বে রাখালের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। হরিহর রাগে গর গর করতে করতে বললে, এ সব বাড়াবাড়ি চোখে দেখতে পারি না। দয়া করবার যেন আর লোক নেই গাঁয়ে। টাকায় যার পাঁ্যাতলা পড়চে—

'টাকা থাকতে যে হাত পেতে চাইতে আসে, সেই ত আরও দয়ার পাত্র হরিদা'—বলতে বলতে শিশির নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো।

হরিহর বললে, রায়বাহাদুরের বাড়ী থেকে খানিক আগে হীরালাল বাবু ডাকতে এসেছিলেন। সেখানে এখুনি যাওয়া দরকার।

শিশির বললে, তার আগে যারা এখানে এসেচে, তাদের দেখাটা ঢের বেশী দরকার। এদের দেখেই যাব'খন।

হরিহর কতকটা আপন মনে বললে: সে আপনার মর্জ্জি।

ওদিকে স্থমিত্রা ডাক্তারের জন্যে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কি একটা কাজে বারান্দা দিয়ে সে যাচ্ছিল, এমন সময় হীরালালকে উপরে উঠতে দেখা গেল। স্থমিত্রা অপ্রসন্ন মুখে বললে, কই আপনাদের শিশির ডাক্তার তো এখনও এলেন না!

হীরালাল বললে, সে কি, আমি ত কোন্ সকালে [illegible]র দিয়ে এসেছি।

[illegible] বিরক্তভাবে সে আবার বললে, এইজন্যেই তখন আপনাকে বলেছিলাম, শহর থেকে অন্য কোন ডাক্তার ডেকে আনি। কি স্পর্দ্ধা ভাবুন দেখি! কত বড় ভাগ্য তোর যে, তুই রায়বাহাদুরের চিকিচ্ছে করবার স্থযোগ পাচ্ছিস। ডাক দিলে তুই ছুটে আসবি না আর সব ফেলে! তার বদলে কিনা সাহেবী চাল!

হীরালাল এক মিনিট থামলো, কিন্তু স্থমিত্রার তরফ থেকে আর কোন কথা না পেয়ে বললে, আমি আর একবার না হয় যাই।

স্থমিত্রা কোন কথা বলেনি, কারণ এতক্ষণ তার দৃষ্টি ছিল বারান্দার ওপরে বাইরের পথের দিকে। সেইদিকে চোখ রেখেই স্থমিত্রা বললে, আপনাকে আর যেতে হবে না; তিনি বোধহয় এই দিকেই আসচেন।

স্থমিত্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখা গেল, শিশির চৌধুরী বাড়ীর দিকেই আসছে। তার পিছনে পিছনে সাইকল চালিয়ে আসছে একটি মেয়ে, বয়স চোদ্দ পনরোর কম নয়। শিশির এক মনে পথ চলছিল সে দিকে লক্ষ্যই করেনি, পিছন থেকে বেলের ঘন ঘন আওয়াজে সেই দিকে ফিরে তাকাল। মেয়েটি তাকে কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে সাইকল্ থেকে একেবারে পড়ে যাবার উপক্রম!

কিন্তু তার জন্যে সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না, বরং তার খিলখিল হাসি জনবিরল পল্লীর পথ মুখর করে তুললো। শিশির হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে সাইকল্ থেকে নামতে সাহায্য করলে।

শিশির-ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েটির কি কথা হোলো তা বারান্দা থেকে শোনা গেল না। কিন্তু সেইদিকে চেয়ে সুমিত্রার দুই চোখ যেন অস্বাভাবিক প্রখর হয়ে উঠল। হীরালালের দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে, আপনাদের গ্রাম তো খুব আপ-টু-ডেট্ দেখচি হীরালালবাবু, এত বড় মেয়ে সাইকল্ চড়ে রাস্তায় বের হয়! শহরেও তো এই রকম দৃশ্য দেখা যায় না।

হীরালাল মুখ ভঙ্গী করে বলে উঠল, ওদের কথা আর বলবেন না। সমস্ত গ্রামের কলঙ্ক। যেমন উন্মাদ বাবা, তেমনি ধিঙ্গী অসভ্য মেয়ে।

উন্মাদ বাপটি কে? সুমিত্রা জানতে চাইল।

হীরালাল বললে, ওই আমাদের বেণীমাধববাবু। এত কাল বাইরে কোথায় কণ্ট্রাকটারী করতেন। বুড়ো বয়সে গ্রামে ফিরে এসেচেন সকলকে জ্বালাতে। ওই বুড়োই তো শিশির ডাক্তারের সব বদ মতলবের সহায়।

সুমিত্রা কোন কথা না বলে আবার বাইরে পথের দিকে চাইল। এবার দেখা গেল, সেই ধিঙ্গী মেয়েটা হাত ধরে শিশিরকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলচে। ওরা খানিকটা কাছে এসে পড়ায় এবার তাদের কথাবার্ত্তাও শোনা গেল।

মেয়েটি বললে, না এখুনি আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে।

শিশির হাসতে হাসতে বললে, যাব রে পাগলী যাব। কিন্তু এখানে একটা 'কল' আছে, সেটা সেরেই তোমাদের ওখানে যাব।

মেয়েটি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলে উঠল, [illegible] এখানে আবার কিসের কল্! ও ভুতুড়ে বাড়ীতে কেউ থাকে [illegible]

শিশির জবাব দিল, হ্যাঁরে আজকাল থাকে। ওই দেখচিস না। বলে সে চৌধুরী বাড়ীর বারান্দার দিকে আঙ্গুল দেখাল। সুমিত্রা সেটা লক্ষ্য করে একটু বিরক্তভাবে সরে এল সেখান থেকে।

শিশির মেয়েটিকে আবার বললে, আমি এখানকার কাজ সেরেই যাচ্চি, বুঝছিস—মেয়েটি এবার মুখ ভার করে সাইকেল উঠে পড়লো, যেন সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শিশির হাসতে হাসতে বললে, শোন্ ইলা শোন। রাগের চোটে যেন বাইক-শুদ্ধ খানায় পড়ে হাত পা ভাঙিস না।

ভাঙি ভাঙব। আপনাকে তো আর জুড়ে দিতে হবে না, বলতে বলতে ইলা সাইকল্ দিল চালিয়ে। শিশির একটু হেসে চৌধুরী বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। শিশির রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুকতেই হীরালাল বলে উঠল, আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম, কোন জরুরী 'কলে' গেছেন বুঝি!

শিশির খাটের পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললে, কল ছিল না, তবে তার চেয়ে জরুরী কাজ ছিল—ডিস্পেন্সারীর দাতব্য রুগীদের দেখা।

সুমিত্রা প্রশ্ন করল, দাতব্য নয় বলেই কি এখানে রুগী দেখতে আসা আপনার কাছে জরুরী কাজও নয়?

নিশ্চয় জরুরী। কিন্তু তার সময় আছে। বেশী দরকার পড়লে আপনারা তো আবার খবর পাঠাতেন। রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে শিশির বললে, ব্যাথা তারপর নতুন করে হয়েচে কি?

জবাব দিলে সুমিত্রা, না।

ঘুম হয়েছিল ?

হ্যা, খানিকটা।

বেশ তাহলে এই ওষুধই এখন চলবে। পথ্যি যথারীতির মতকা, আজকের মত দুধ বার্লি, মিষ্টি ফলের রস, এরারুট বিস্কুট, কিন্তু…

পথ্যি কি খেতে হবে আমি জানি, রায়বাহাদুর বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। কিন্তু এইভাবে কত দিন আমায় অকর্ম্মণ্য করে শুইয়ে রাখতে চান, জানতে পারি ?

শিশির বললে, এ-কথা জানতে চাইছেন দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনার খানিকটা উন্নতি হয়েচে। কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি, শুয়ে আপনাকে এখন বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। খেতাবের জন্য লোককে যত খাতির করেচেন, তার সিকি খাতির শরীরকে করলে, এ রকম রোগে আপনাকে আজ শুয়ে থাকতে হ'ত না।

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, এ-সব কথা আপনার কাছে শুনতে চাই না—

তুমি চুপ করো বাবা। মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ো না। বলে সুমিত্রা শিশিরের দিকে চাইল। চাপা গলায় বললে, কিন্তু আপনি কি আপনার ডাক্তারীর সীমার একটু বাইরে যাচ্ছেন না, শিশিরবাবু ?

শিশির বললে, রোগী যদি ডাক্তারের ওপর মুরুব্বিয়ানা করে, তাহলে ডাক্তারকে বাধ্য হয়েই সীমা একটু ছাড়াতে হয়। যাই হোক, আপাততঃ ভাবনার অন্য কোন কারণই নেই। ঠিকমত বিশ্রাম ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলে এবং ওষুধ-পথ্য খেলে, দিন পনর'র মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন, আশা করি।

সেই দিন পনের ! রায়বাহাদুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন—দিন পনর আমি এখানে কিছুতেই শুয়ে থাকবো না।

সুমিত্রা বললে, আচ্ছা, এ সব কথা এখন থাক বাবা।

শিশিরের দিকে চেয়ে সুমিত্রা আবার বলল, আচ্ছা, নমস্কার ডাক্তার বাবু। দরকার হলে বাড়ীতে খবর দিলেই বোধহয় আপনাকে পাওয়া যাবে।

হীরালাল বলে উঠল, উহুঁ, উনি আবার বাড়ীতে সব [illegible] থাকেন না। ওঁকে পেতে হলে—শিশির কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, আমাকে ডিসপেন্সারী ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায় তা হীরালাল বাবু ভাল ভাবেই জানেন; বেণীমাধববাবুর বাড়ীতে খোঁজ করলেই আমায় পাবেন।

ও, সেইখানেই আপনি থাকেন! আচ্ছা, নমস্কার!

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর এবার একটু অদ্ভুত শোনাল—হীরালালবাবু, আপনি শিশিরবাবুকে নয় নামবার সিঁড়িটা—

শিশির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ষ্টেথস্কোপটা পকেটে পুরতে পুরতে শিশির বললে, নামবার সিঁড়িটা জানি, কিন্তু আমি শুধু ভিজিটের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কথাটা বাধ্য হয়ে মনে করিয়ে দিতে হ'ল, কিছু মনে করবেন না।

ও! না, না, আমারই দোষ। আপনার কালকের ভিজিটটাও দেওয়া হয়নি। সুমিত্রা টাকা বা'র করতে করতে বলল, আপনি বেশী ভিজিট দিলে নেন না, কিন্তু ভিজিটের কথা ভোলেনও না দেখছি।

শিশির হাসবার চেষ্টা করে বললে, না, তা ভুলিনা।

আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা সেদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল। গ্রামের জনবিরল পথ ধরে চলতে চলতে সে এসে পড়েছিল প্রকাণ্ড এক বাগানের মধ্যে, হঠাৎ

খাবেন একটা ?

বিস্মিত সুমিত্রা মুখ তুলে চেয়ে দেখে, পেয়ারা গাছের ডালে বসে ইলা তাকে প্রশ্ন করচে।

নাঃ, তোমার গান শুনি। সুমিত্রা হাসতে হাসতে বললে।

ইলা গাছের ডালে বসেই পা দুটি দুলোতে দুলোতে আবার গান সুর করে।

গান শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুমিত্রা চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। ইলা কিন্তু এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। গাছের ডাল থেকে ঝুপ করে মাটিতে নেমে এসে প্রশ্ন করে, বাঃ চলে যাচ্ছেন যে বড় !

আর কি করব তাহ'লে ? সুমিত্রা এগিয়ে যেতে যেতে বলে।

বাঃ, আমাদের বাড়ী যাবেন না।

যেন সুমিত্রার ইলাদের বাড়ীতে যাওয়ার কথাটা অনেক আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

তোমাদের বাড়ীতে ? সুমিত্রার কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতুক।

না গেলে আপনাকে ছাড়চে কে ? বাবা কত খুশি হবেন। শিশির-দার কাছে আমি সব শুনেচি।

আসুন।—হাত ধরে সুমিত্রাকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে ইলা বলে, একটা কথা কিন্তু আপনাকে বলে রাখি, বাবার যন্ত্রপাতির যেন নিন্দে করবেন না।

না, না, নিন্দে করবো কেন, একটু, বিব্রতভাবেই বলে সুমিত্রা-কিন্তু যন্ত্রপাতি আবার কি!

সে বাবার এক পাগলামি। চলুন না দেখবেন। বাবা তো রাতদিন কারখানাঘরেই থাকেন।

আর কোন কথা জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়ে, সুমিত্রাকে ইলা হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চললো।

সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে ইলা যখন বেণীমাধবের কাছে পৌছল, তখন তিনি একমনে কি একটা যন্ত্র নিয়ে নিরীক্ষণ করছেন।

বাবা, এই দেখ কে এসেচেন।

বেণীমাধব যন্ত্র থেকে মুখ না তুলেই বলেন বেশ, বেশ, ভাল আছ তো মা?

সে কি বাবা, তোমার যে এখনও পরিচয় হয়নি।

তাইত, তাইত!—বেণীমাধব যেন রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েন।

ইনি হলেন আমাদের জমিদারবাবুর মেয়ে—পরিচয় দিতে গিয়ে ইলা সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, এই যাঃ, আপনার নাম তো জানি না।

আমার নাম সুমিত্রা।

তাহলে, আপনি আমার সুমিত্রা-দি।

বেণীমাধবের পাশে দাঁড়িয়েছিল আর একটি মেয়ে, বয়সে ইলার চেয়ে কিছু বড়। তার দিকে চেয়ে ইলা বলে, ওই আমার বড়-দি মীরা।

মীরা সুমিত্রাকে নমস্কার জানায়। কিন্তু বেণীমাধব বা মীরা সুমিত্রাকে দেখে কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই ইলা আবার সুরু করে: জানেন সুমিত্রা-দি, আমরা বাবার আগের পক্ষের দুয়োরাণীর মেয়ে। আর বাবার সত্যিকার আদরের সুয়োরাণীর—ছেলে মেয়ে এই সব।

ইলা ঘরময় ছড়ানো নানারকম যন্ত্রপাতির দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে শুরু করে। সুমিত্রাও হেসে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেণীমাধবও সে হাসিতে যোগদান করেন। কিন্তু হাসির মাঝেই হঠাৎ যেন ছেদ পড়ে যায়। মীরার মুখের দিকে চেয়ে বেণীমাধব বললে, জানো না, আমার একটি মেয়ে জন্মদুঃখী।

কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে তিনি আবার বলেন, আর একটা পাগলী। কিন্তু পাগলী ঠিক বলচে মা, ওদের দিকে চাইবার সময় আমি পাই না।

—লক্ষ্মী বাবা, অমন কথা বোলো না। তোমার মতন বাবা ক'জনের আছে।

ইলা যেন বেণীমাধবের মনের মেঘটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বেণীমাধব সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলেন, কি জানো-মা, এ একটা নেশা। বুড়ো বয়সে লোকে নেশা ধরে, আমার আফিং বল এই কলকব্জা। অন্য দেশের লোক কলের দৈত্য দানবকে বেঁধে কাজ করাচ্চে, আমাদের গরীব দেশে সে যখন নেই, সে সাহসও নেই। আমাদের শুধু দুটো হাত, তা-ও অকেজো। সেই ছোট হাতে যাতে অন্ততঃ দশটা হাতের কাজ হয়, তাই আমার চেষ্টা। জানি মা, সবই হয়তো মিথ্যে, দেশের লোকের সাড়াই নাই। ওই যে শিশির ডাক্তার বলে না যে, এদেশে একবার সেই আদ্যি কালের গরুগাড়ী চড়েছিল আর তা' থেকে নামে নি, কথাটা তো মিথ্যে নয়। কিছু মনে করো না, মা, বুড়ো মানুষ একটু বেশী বকি, লোকে বিরক্ত হয়—

না, না, সে কি বলচেন, আমার খুব ভাল লাগচে। আমি একদিন সব ভাল করে দেখে যাব। শিশিরের কথা এসে পড়ায় একটু ভাবান্তর ঘটলেও সুমিত্রা সহজভাবেই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করে।

ইলা বলে ওঠে, থাম বাবা, শিশিরদা যে এখন এঁদের বাটীতে ডাক্তারী করেন। এঁর বাবাকে দেখচেন।

তাই নাকি! শিশিরকে তাহ'লে জানো!—বেণীমাধব যেন খানিকটা চিন্তিত হয়ে বলতে থাকেন, গাঁয়ে ওই একটা মানুষ আছে মা, কেমন করে ভুলে এসে পড়েচে। আর সবতো পোকা মাকড়, সবাই বুকে হাটে। কারুর বিষ আছে, কারুর নেই, এই যা তফাৎ। কিন্তু তোমার বাবা যে শিশিরকে বাড়ী ঢুকতে দিলেন। এত খাটি লোক ওঁর ধাতে সয় না।

বেণীমাধবের মুখে ঠিক এই ধরণের কথা শোনবার জন্য সুমিত্রা প্রস্তুত ছিল না, কাজেই বিব্রত বোধ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। বোধহয় তার সেই ভাবটী লক্ষ্য করেই মীরা বলে উঠে, ওসব কথা থাক বাবা।

মেয়ের কাছে বাধা পেয়েও বেণীমাধব নিরস্ত হন না, বলেন থাকবে কেন মা! বুড়ো হয়েচি, দাঁত পড়েচে, আর কি মুখ সামলে কথা বলতে পারি? সুমিত্রার দিকে চেয়ে তিনি বলেন, সত্যি কথা, তোমার বাবা বড় বোকা লোক, ফসল ফেলে আগাছারই চাষ করে যাচ্ছেন।

বাবা তো এখানে থাকেন না, সব কথা কি করে জানবেন।

সুমিত্রা ঠিক অসন্তুষ্ট হয়েছে কি না, বোঝা যায় না।

বেণীমাধব আরও উৎসাহিত কণ্ঠে বলতে থাকন, ওই না থাকাটাই যে অপরাধ মা। নিজের গাঁয়ে এসে দুদিন থাকলে বুঝতে পারতেন, শিশির ডাক্তার এ-গাঁয়ের কতখানি! ও-তো এখানে শুধু ডাক্তারী করতে আসেনি। এ-গাঁয়ে সাত জন্ম থাকলেও যে ডিগ্রীর খরচা উঠবে না তা সে জানে। ও এসেচে শুধু রোগ সারাতে নয়, এদের মানুষ করবার তপস্যা নিয়ে।

বেণীমাধব বোধহয় আরো কিছুক্ষণ শিশির ডাক্তারের গুণগান করতেন, শিশির ডাক্তার স্বয়ং এসে পড়ায় ছেদ পড়লো।

এই যে শিশিরদা, নিজের প্রশংসাটি শুনবার জন্য ঠিক সময় এসেছ তো! দুষ্টুমী-ভরা কণ্ঠে ইলা বলে ওঠে।

শিশির মৃদু হেসে সুমিত্রার দিকে চেয়ে তাকে নমস্কার জানায়।

'নমস্কার' শিশিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুমিত্রা তাকাল ইলার দিকে।

—আচ্ছা, এখন তাহলে আসি। আর একদিন আবার আসবো।

সুমিত্রা চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

শিশির একটু এগিয়ে এসে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—দেখুন, এখুনি আপনি চলে গেলে নিজেকে আমার কিন্তু অত্যন্ত অপরাধী মনে হবে।

কেন বলুন তো? সুমিত্রা এবার শিশিরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

—মনে হবে যে, আমি এমন অসময়ে না এলে আপনাকে চলে যেতে হ'ত না।

মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলে, আমি আপনার জন্যেই চলে যাচ্ছি মনে করচেন?

ঘটনার যোগাযোগ সেই রকমই তো মনে হচ্চে।—শিশির হাসবার চেষ্টা করে। না, নিজেকে অতখানি মর্য্যাদা দেবেন না। আমি নিজে থেকেই যাচ্চি। বাবাকে অনেকক্ষণ একলা রেখে এসেছি। আমার যাওয়া দরকার।

সুমিত্রা যাবার জন্য আবার পা বাড়ায়। শিশির এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর সুমিত্রার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, তা বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে আপনাকে আমায় এগিয়ে দিতেই হবে।

এগিয়ে দিতেই হবে।—সুমিত্রার কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতূহল।

হ্যাঁ, না দিলে মনে খুঁত থেকে যাবে। একটু থেমে শিশির যেন সুমিত্রাকে আঘাত দেবার জন্যেই বলে, ভয় নেই. এগিয়ে দেবার জন্য ফী লাগবে না। ডাক্তারী পোষাক ছেড়ে এসেচি।

শিশিরের কথার ধরণে সবাই হেসে ওঠে। সুমিত্রা কিন্তু শিশিরের সঙ্গে যাবার কথায় আর আপত্তি করে না। এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ডাক্তারীটা আপনার যে শুধু পোষাক, তা জানতাম না।

আমায় কতটুকুই বা জানেন। শিশির সুমিত্রার সঙ্গে যেতে যেতে বলে।

বেণীমাধব আর ইলা ওদের চলে যাবার পথের দিকে খানিক চুপ করে চেয়ে থাকেন। তারপরে ইলা যেন নিজের মনেই বলে ওঠে, দুজনকে ভারী চমৎকার মানায় কিন্তু।

—আমাদের চোখে যা মানায়, বিধাতা যে তা' মানেন না ;—বলে বেণীমাধব আবার যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে মন দেবার চেষ্টা করেন।

মীরা এবং ইলা দুজনেই এবার বাড়ীর ভিতরের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু ওদের চলে যাবার আগেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত অবস্থায় হীরালাল এসে হাজির হয় সেখানে।

আপনি কি আমায় মান সম্ভ্রম রেখে গাঁয়ে বাস করতেও দেবেন না। বেণীমাধবের দিকে চেয়ে হীরালাল যেন রাগে ফেটে পড়ে।

মানসম্ভ্রম জিনিষটা কোনদিন তোমার ছিল কি, যে আজ নালিশ করতে এসেছ! হীরালালের দিকে না চেয়েই বেণীমাধব কথাগুলো বল্লেন।

আপনি কোন কিছুরই ধার ধারেন না, আমি জানি। হীরালাল বলতে থাকে, কিন্তু এসব অনাচার অন্য কোথাও করলে আমার বলবার

কিছুই থাকতো না। আপনার বুড়ো বেহায়া মেয়ে গাছে উঠে পেয়ারা পাড়বে, ধিঙ্গী হয়ে রাস্তায় [illegible] বেড়াবে, [illegible] আমারই মাথা হেঁট হয়, লোকে আমাকে দোষ [illegible]

লোকে অত নির্ব্বোধ বোধহয় নয় হীরালাল। বেণীমাধব বেশ শান্তভাবেই বলেন, আমার মেয়ে বেহায়া হলে তোমার মাথা হেঁট হবে কেন?

নেহাত একটা সম্পর্ক আমার কপালে হয়েছিল তাই!

সম্পর্কটা আমরা যখন ভুলে গেছি, তখন তুমি তা প্রচার করতে এত ব্যস্ত কেন, বুঝতে পারচি না তো! বেণীমাধবের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠে, শোন হীরালাল, তোমার মতলব আমি জানি। আমার মেয়েকে তুমি একদিন নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করে টাকার লোভে নূতন করে বিয়ে করেছিলে। আজ আমি হঠাৎ বড়লোক হয়েচি মনে করে তুমি ভাঙ্গা সম্পর্ক নতুন করে ঝালিয়ে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ। কিন্তু যা ভাবচো তা হবে না হীরালাল।

কি ভাবচি আমি? আমি আপনার টাকার প্রত্যাশী?

তা না হলে, আগে তো কখন ঘন ঘন এমন নানা ছুতোয় আমাদের বাড়ী আসতে না। কিন্তু তোমার বৃথা আশা হীরালাল। মীরার দিকে চেয়ে বেণীমাধব বলতে থাকেন, আমার মেয়ে দুঃখ যা সইবার সয়েছে, তার আর চারা নেই। কিন্তু আর আমি তাকে অপমান সইতে দেব না। আমি মরে গেলে আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও যাতে তুমি না পাও, তেমনি করে আমি উইল করেচি। শিশির ডাক্তার তার ট্রাষ্টি, এটুকু জেনে রাখ।

বেণীমাধব আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

হীরালাল উত্তেজিতভাবে ইলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ

করে, শুনলে, শুনলে তোমার বাবার কথা! আমায় শাসিয়ে গেলেন, সম্পত্তির কাণাকড়ি দেবেন না! আমি যেন ওঁর টাকার কাঙালী।

শিশির ডাক্তার কেন এখানে ঘুর ঘুর করে আসে, তা যেন আমি বুঝি না! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে হীরালাল এবার মীরার দিকে তাকায়—ভেবেছিলাম, ভুলচুক যা হয়ে গেছে এবার তা শুধরে নেব। বিয়ে না হয় আর একটা করেছিলাম। কিন্তু সে তো মরে গিয়ে সব গোল মিটিয়ে দিয়েচে। এখন আর তোমায় নিয়ে যেতে বাধা কি! কিন্তু এসব কথার পর আর কি ইচ্ছে হয়!

মীরা এক পাশে মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল। তার তরফ থেকে এতটুকু সাড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। হীরালাল আবার সুরু করে, সেদিন রায়বাহাদুরের মেয়ে সুমিত্রাদেবী তোমাদের কাণ্ড দেখে কি রকম ছি ছি করতে লাগলেন। তোমার বাবা না হয় কারও ধার ধারেন না, কিন্তু আমাকে তো সমাজে মেলামেশা করতে হয়।

ইলা বলে, সুমিত্রাদেবী আজ এখানে এসেছিলেন খানিক আগেই।

এখানে এসেছিলেন? হীরালালের গলার স্বর আশ্চর্য্য রকম বদলে যায়।

হ্যাঁ, এইমাত্র শিশিরদার সঙ্গেই যাচ্চেন! ইলার কণ্ঠে দুষ্টুমীর সুর।

হীরালাল মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কি যে ভাবে, ঠিক বোঝা যায় না। তারপর যেন ঘুম থেকে চমকে উঠে বলে: শিশির-ডাক্তারের সঙ্গে গেল বুঝি! ওঃ, আচ্ছা—

হীরালাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, যেন কি একটা ভয়ানক জরুরী কাজ তার মনে পড়ে গেছে!

দু'তিন দিন পরের কথা। রায়বাহাদুর দোতলায় বারান্দায় বড় একটা কৌচে হেলান দিয়ে সিগার টানছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো নিবদ্ধ

ছিল হাতের খবরের কাগজের 'পাতাটার উপর। হীরালাল যেন রায়বাহাদুরের খবরের কাগজ পড়া শেষ হবার অপেক্ষায় তাঁর পাশেই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

শিশিরকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রা এসে দাঁড়াল সেখানে।

—ডাক্তারবাবু এসেচেন বাবা।

—ডাক্তারকে ত আজ 'কল' দেওয়া হয় নি, খবরের কাগজের পাতা-থেকে মুখ না তুলেই রায়বাহাদুর বলেন।

উত্তরটা দেয় শিশির।—কল না দিলেও আমাদের কখনও কখনও আসতে হয় রায়বাহাদুর। বিশেষতঃ আপনাদের মত রোগীর বাড়ী।

রায়বাহাদুরের মুখের সিগারটা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে শিশির বলে: হুঁ, এই জন্যেই তো আসাটা আরও ঠিক হয়েছে। এ সিগার খেতে আপনাকে হুকুম দিলে কে?

আমি কারও হুকুমের তোয়াক্কা রাখি না।

রায়বাহাদুর যে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েচেন তা তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায়।

তা জানি। কিন্তু আপনার দুর্ব্বল দেহ যন্ত্রটা রাখে—সিগারটা বারান্দার বাইরে ফেলে দিয়ে শিশির সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করে: এ সিগার কে এনে দিয়েচে?

আমি তো জানি না। আমি তো সিগারের বাক্স আমার ঘরে তুলে রেখেছিলাম।—সুমিত্রা জানায়।

শিশির রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বলেন, ও সিগার আমি নিজে আনিয়েচি।

তা বুঝেছি। কিন্তু এনে দিলে কে—শিশির জানতে চায়।

আমি—আমি মানে, রায়বাহাদুর বললেন, তাই একটা এনে দিলাম, হীরালাল বলে।

আপনি তো রায়বাহাদুরের পরম হিতৈষী দেখা যাচ্চে। শিশিরের কণ্ঠস্বর একটু কঠিন হয়ে ওঠে, আমি ওঁকে পনের দিন শুয়ে থাকতে বলচি, আপনি দেখচি ওঁকে একেবারেই শুইয়ে দিতে চান। দেখি আপনার pulse, দেখি জিভটা দেখি—

কোন দরকার নেই, আমি বেশ ভাল আছি।—রায়বাহাদুর মুখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশির তাঁর জিভ পরীক্ষা না করে নিরস্ত হয় না। তারপর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, হ্যাঁ চুরুটের বাক্সটা আজই পুড়িয়ে ফেলবেন। আর ওষুধ যেমন চলচে তেমনি চলবে।

হীরালাল যেন এতক্ষণ কিছু বলবার অপেক্ষায় ছিল, এতক্ষণে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে। শুধু ওষুধে আর কি হবে ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ওষুধ যখন চালাচ্ছেন—

তার মানে? শিশির একটু আশ্চর্য্য হয়েই প্রশ্ন করে।

তার মানে? হীরালাল খবরের কাগজখানা রায়বাহাদুরের হাত থেকে নিয়ে শিশিরের সামনে মেলে ধরে, এতে ভূষণা গ্রাম সম্বন্ধে যে চিঠিটা বেরিয়েচে সেটা একবার পড়ে দেখুন না।

—আমার দরকার নেই।

—দরকার নেই তা জানি। কি বেরিয়েচে তাতো আপনার অজানা নয়! কিন্তু লোকালবোর্ড সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদগুলো ঠিক এই সময়েই কাগজে বার না করলে কি চলতো না। রায়বাহাদুরের এই কঠিন অসুখে—

হীরালালের উচ্ছ্বাসের মাঝ পথেই শিশির বলে ওঠে, রায়বাহাদুরের

অসুখ বলে লোকালবোর্ডের সাতখুন তো মাফ হয়ে যায় না হীরালালবাবু। তা ছাড়া লোকালবোর্ড যদি ওঁর এতই প্রাণের জিনিষ হয় যে তার নিন্দে ওঁর প্রাণে লাগে, তাহলে নিজের শরীরের সঙ্গে রায়বাহাদুর তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

আপনি তা হলে বলতে চান লোকাল বোর্ডকে রোগে ধরেছে! এসব অভিযোগ আপনি সত্যি বলেন?

আমি কিছুই বলতে চাই না হীরালালবাবু। এখানে আমি ডাক্তার মাত্র।

বাইরেও শুধু ডাক্তারী নিয়ে থাকলেই বোধহয় ভাল কর্তেন শিশিরবাবু। দুনৌকায় পা দেওয়াটা ভাল নয় শুনেচি। রায়বাহাদুরের কণ্ঠে হুমকীর সুরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিশির কিন্তু বেশ শান্তভাবেই জবাব দেয়,—সেটা পায়ের টাল আর নৌকার হালের ওপর নির্ভর করে রায়বাহাদুর। প্রাণের ভয় যার বেশী সেতু ডাঙা ছেড়ে এক নৌকাতেই পা দেয় না। আচ্ছা আমি এখন আসি।

বেরিয়ে যাবার আগে শিশির সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বলে, ওষুধটা এখনই একবার দেবেন।

শিশির ঘরের বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হীরালালের রুদ্ধ আক্রোশ যেন ফেটে পড়ে।

—দেখলেন, আস্পর্দ্ধাটা দেখলেন একবার। আপনার মুখের ওপর বলে গেল লোকাল বোর্ডের চিকিৎসা দরকার।

বাবার এখন বিশ্রাম দরকার হীরালালবাবু, এসব আলোচনা এখন না করলেই ভাল হয়।

ওঃ, হ্যাঁ, তাই বটে। আচ্ছা আমি বরং এখন আসি।

সুমিত্রার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আর কোন কথাই বলবার সাহস হীরালালের হয় না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই সুমিত্রাকে বলতে শোনা যায়, আর ভবিষ্যতে এরকম কাগজপত্র এখানে দেখাতে আসবেন না।

না, না, কাগজপত্র আর কিসের। নেহাত একটা হাতে এসে পড়লো তাই।

হীরালাল একটু বিব্রত ভাবেই বিদায় নেয়। সুমিত্রা এবার রায়বাহাদুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

ওষুধটা খেয়ে নাও বাবা।

ওষুধ আমি খাব না। কালই আমি শহরে যাব।

না বাবা, তাকি হয়। আর কটা দিন বইতো নয়।

কটা দিন! ও মুখ্যু গোঁয়ার জানে কি!

সুমিত্রা একটু হেসে জবাব দেয় ডাক্তারীটা অন্ততঃ জানে বাবা।

হুঁ! রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে মুখটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। সুমিত্রা ওষুধের শিশি আর গ্লাসটা এনে তাঁর সামনের টিপয়ের ওপর রাখে। ...

আরও কয়েকটা দিন পরে।

রায়বাহাদুর তার ঘরে বসেছিলেন। সুমিত্রা শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে তাঁকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিল। শিশির ঘরে ঢুকতেই রায়বাহাদুরের মুখখানা আবার অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। শিশির বোধ হয় তার সেই ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করেই বলে, যাক, আর আপনাকে ওষুধ খেতে হবে না। এই শেষ।

অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে ওষুধটুকু খেয়ে নিয়ে রায়বাহাদুর বলেন, এখানে থাকাও আজই শেষ! কটাদিন আমার বাজে নষ্ট!

তা বলতে পারেন বটে, তবে কটা দিন বাজে নষ্ট করে যা মেরামত হয়ে গেলেন কটা বছর এখন তার জোরে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। যদি না অবশ্য অতিরিক্ত অত্যাচার করেন।

হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে শিশির বলে, আমার কাজ শেষ হয়েছে আমি চলি।

রায়বাহাদুর শুকনো একটা নমস্কার জানিয়ে চুপ করে থাকেন, একটি কথাও বলেন না।

সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল রায়বাহাদুরের পাশটিতে মাথা হেঁট করে, তার পক্ষ থেকেও একটা ধন্যবাদের কথা শোনা যায় না। মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে শিশির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তারপর সুমিত্রা বোধ হয় মিনিট-খানেক সেখানে স্থির হয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে আর সেই এক মিনিটের মধ্যেই হঠাৎ কি যেন একটা ঠিক করে ফেলে।

আমি আসচি বাবা—

রায়বাহাদুরের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সুমিত্রা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রায়বাহাদুর রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে মেয়ের চলে যাওয়ার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করেন। কিছুই ঠিক বুঝতে পারেন না।

বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে সুমিত্রার ডাকে শিশিরকে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়েই থামতে হয়।

কই ভিজিট না নিয়েই চলে যাচ্ছেন যে! সুমিত্রা যে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেচে তার প্রমাণ তার নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়।

ও, ভুলে গিয়াছিলাম—

এরকম ভুল আপনার তো হবার কথা নয়। সুমিত্রা শিশিরের মুখের দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করে।

আজকাল তো হচ্ছে দেখচি। শিশিরের কণ্ঠস্বর তার নিজের কাছেই যেন একটু বেসুরো শোনায়।

কিন্তু আমি ভুলিনি দেখচেন। সুমিত্রা তার নিজের ঘরের সামনে গিয়ে বলে, আসুন।

শিশির আরও একটু আশ্চর্য্য হয়ে সুমিত্রার পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। সুমিত্রা কোন কথা না বলে আলমারী খুলে সুদৃশ্য একটি ছোট বাক্স বার করে। বাক্সটি খুললে দেখা যায় সোনা বাঁধানো একটি ফাউণ্টেনপেন।

এ আবার কি! শিশিরের কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে বিহ্বল।

বাবাকে আপনি ভাল করে দিয়েছেন এ তারি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। সুমিত্রা যেন ভাল করে শিশিরের দিকে চাইতে পারে না।

না, না, এসব কি পাগলামী করচেন,—শিশির আপত্তি জানাবার চেষ্টা করে, তাছাড়া আমি ডাক্তার মানুষ, এ সৌখীনি জিনিস নিয়ে কি করবো?

কি আর করবেন, লিখবেন। কি একটা ভাঙ্গা কলমে প্রেসক্রিপসান লেখেন, পড়াই যায় না।

সুমিত্রার কণ্ঠে এবার যেন ছেলেমানুষীর স্বর।

শিশির মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করে থেকে কি যেন ভাবে। তারপর সুমিত্রার চোখের দিকে চেয়ে বলে; কিন্তু এ কলমে প্রেসক্রিপসান যে মোটেই লিখতে পারবো না।

কেন বলুন তো?

সব ভুল হয়ে যাবে হয়তো!

না, না, হবে না, নিন এ কলম. আপনাকে নিতেই হবে—সুমিত্রা যেন নিজের অজ্ঞাতেই কলমটা বাক্স থেকে তুলে নিয়ে শিশিরের কোটের বুক পকেটে পরিয়ে দিতে যায়। পর মুহূর্ত্তেই কি যেন মনে পড়ায় নিজেকে সংবরণ করে ফেলে; কলমটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন শিশির কি করে তাই দেখবার অপেক্ষায়!

শিশিরও এতক্ষণ বিস্মিত, মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল সুমিত্রার দিকে। হঠাৎ তার মনে হয়, এতদিন সে যে সুমিত্রাকে দেখছিল এ সে নয়। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কলম সমেত কাস্কেটটা তুলে নিয়ে সে পকেটে রাখে, তারপর বলে, আচ্ছা ধন্যবাদ। নমস্কার—

নমস্কার······সুমিত্রা যেন অনেক দূর থেকে কথা বলে।

শিশির দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দুচোখের উদাস দৃষ্টি গ্রাম প্রান্তের গাছ-পালাগুলো ছাড়িয়ে আরও কতদূরে ভেসে যায় কে জানে। এমনি ভাবে কতকক্ষণ সে একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল তার হিসাব নেই—

আমি ভেবে দেখলাম—

হঠাৎ ঘরের মধ্যে শিশিরের কণ্ঠস্বর শুনে সুমিত্রা চমকে উঠলো! শিশির যে কখন ফিরে এসেচে তা সে বুঝতেই পারে নি।

ভেবে দেখলাম, পুরস্কার যদি নিতেই হয় এত সামান্য পুরস্কারে আমার চলবে না! শিশিরের কণ্ঠস্বরে রীতিমত আত্মপ্রত্যয়ের সুর, এরি মধ্যে সে যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে ফেলেচে।

এটা তা হ'লে আপনি নেবেন না? সুমিত্রার কণ্ঠস্বর আহত।

নিতে অবশ্য পারি, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশী কিছুর, অনেক বড় কিছুর দাবী আমার জানান রইল।

শিশির এবার পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চায়।

সে দৃষ্টির সামনে সুমিত্রা যেন কেঁপে উঠে !

তার মানে ?

তার মানে ? শিশির যেন কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় তারপর বলে, আর একদিন বলবো।

আর একদিন ! কিন্তু আমরা যে আজই শহরের বাড়ীতে চলে যাচ্ছি—সুমিত্রা যেন কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

শিশির এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে জানায়, আপনাদের শহরের বাড়ী কি এতই দুর্গম যে আমার মত দুঃসাহসীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

সুমিত্রার মুখে রকোন কথার জন্যে অপেক্ষা না করেই শিশির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা প্রথমে যেন নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনা। মনে হয়, ভুল শুনেচে কিম্বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেচে হয়ত ! খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর শিশিরের কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করে। হঠাৎ তার সমস্ত দেহ-মন অপরূপ এক মাধুর্য্যে ভরে ওঠে। প্রথম প্রণয় নিবেদনের আকস্মিক উপলব্ধির আনন্দে বিহ্বল সুমিত্রা অলস ভাবে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দেয়।

রায়বাহাদুর কলকাতায় ফিরে যাবার পর শিশিরের মনে হয়, সমস্ত ভূষণা গ্রামখানাই যেন তার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর সেই ভাঙা টিনের চালার মধ্যে বসে রোগী দেখতে দেখতে শিশির যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এতদিন এইসব রুগীদের দেখা এবং আবশ্যকমত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই ছিল শিশিরের

দাবী

জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। এখন যেন মনে হয়, এই ডিসপেন্সারী, রোগী আর প্রেসক্রিপশানের জগতের বাইরে আর একটা জগত আছে এবং সেখানকার আহ্বান অস্বীকার করবার ক্ষমতা তার নেই।

সেদিন দুপুরে রোগী দেখবার পালা চুকে যাবার পর শিশির হঠাৎ হরিহরকে জিজ্ঞাসা করে, এখন কলকাতা যাবার ট্রেন আছে হরি-কাকা?

হরিহর একটু আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেন, এই দুপুর রোদ্দুরে!

শিশির বলে, আমার তো সাইকেল রয়েচে, ষ্টেশনে যেতে কতক্ষণ আর লাগবে! ট্রেন আছে কিনা তাই বলো—

—ট্রেন আবার থাকবে না কেন, আধ ঘণ্টা অন্তর কলকাতায় যাবার ট্রেন পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ…

—হঠাৎ নয় হরিদা, আমাকে যেতেই হবে।

হরিহর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

ভূষণা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাইল চল্লিশের বেশী নয়, কাজেই সেখানে পৌছতে শিশিরের ঘণ্টা তিনেকও লাগে না, তারপর ফার্ণ রোডের কাছাকাছি গিয়ে রায়বাহাদুরের প্রকাণ্ড বাড়ীটা খুঁজে নিতে আর কতক্ষণ!

শিশিরকে দেখে সুমিত্রা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যায়!

সত্যিই এলেন তা হ'লে?

বাঃ, আপনাকে তো বলেই রেখেছিলাম। রায়বাহাদুর কোথায়?

উপরে।

চলুন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। কেমন আছেন তিনি?

ভালই আছেন তিনি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা করে দরকার নেই।

শিশির একটু চুপ করে থেকে বলে, তাহলে কি আপনি আমায় ধূলো পায়ে বিদায় নেবার পরামর্শ দিচ্চেন? আমি কিন্তু তাতে রাজী নই।

শিশিরের কথা বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে সুমিত্রা বলে, আমিও না। কেবল ভাবচি বাবার কথা। জানতে পারলে তিনি খুব রাগ করবেন।

—বাবাকে আপনি খুব ভয় করেন বুঝি?

—সাধারণ নিয়মে একটু করতেই হয়।

শিশির একটু ভেবে বলে, তা হলে এক কাজ করুন। বিশেষ একটা কাজে যাচ্চেন বলে রায়বাহাদুরের কাছে ছুটী নিয়ে আসুন। তারপর কোন সিনেমা কিম্বা রেস্তঁরায়···আমি বরং বাইরে একটু অপেক্ষা করি।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, মাফ করবেন, এরকম ভাবে বাইরে যাবার অভ্যাস আমার নেই! তা ছাড়া বাবার কাছে শুধু শুধু কতকগুলো মিছে কথা বলতেও আমি পারবো না।

—আচ্ছা, নমস্কার। তা হলে চললাম।

শিশির যাবার জন্যে পা বাড়ায়। সুমিত্রার চোখে মুখে এতক্ষণ যে উৎসাহের আলো লেগেছিল সেটা যেন হঠাৎ নিভে আসে। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। তার পরই সে মন স্থির করে ফেলে।

—আপনি আমার পড়ার ঘরে বসবেন চলুন।

কিন্তু···

সুমিত্রা এবার হাসতে হাসতে বলে, কোন ভয় নেই আপনার। বাবা নিচে নামেন খুব কম, তা ছাড়া এ দিকটায় একেবারেই যান না।

সুমিত্রার পড়ার ঘরে পৌছে শিশির কিন্তু বলবার মত কোন কথাই যেন খুঁজে পায় পায় না।

স্মিত্রা তার অস্বস্তির ভাবটা লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে; হঠাৎ চলে এলেন, বেচারী রুগীগুলোর কোন ক্ষতি হবে না তো?

শিশির জবাব দেয়, বেচারী রুগীদের জন্য হরি কাকা আছেন, কিন্তু স্বয়ং ডাক্তার যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তা হলে তার কলকাতায় আসা ভিন্ন উপায় কি!

শিশিরের মুখের দিকে দুষ্টুমীভরা চোখে চেয়ে স্মিত্রা বলে, শুনেচি ডাক্তাররা নিজেদের অসুখের বেলাতেই রোগ নির্ণয় করতে ভুল করে ফেলেন। আপনার বেলায় সে ভয় নেই তো?

শিশির হাসতে হাসতে বলে, সম্ভবতঃ নয়, তা হলে এতদূর ছুটে আসতাম না।

শিশির তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, আপনার দেওয়া ফাউন্টেনপেনটা পকেটে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও এ সম্বন্ধে আমি কিছুই ভাবি নি। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মনে হ'ল আপনার কাছে আমার আরও অনেক কিছুই দাবী করবার আছে। তাই আবার ফিরে এলাম। হয়ত অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই....

...আচ্ছা, বেশ হয়েছে। চুপ করে বস্থন তো, আমি চা নিয়ে আসি...

চায়ের পালা শেষ হবার পর ঘরের মধ্যে অপরাহ্ণের আলো ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে।

স্মিত্রা বলে, বাবার বেড়াতে যাবার সময় হোলো।

—অর্থাৎ এবার আমার সরে পড়া উচিত। না, সত্যিই আর আপনাকে বিব্রত করা ঠিক হবে না।

শিশির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর কতকটা যেন নিজের মনেই বলে, দেখুন, ছেলেবেলা থেকে আত্মীয় স্বজনের বালাই এক রকম নেই বললেই হয়, নিজের খেয়াল আর খুসী নিয়েই চলতে শিখেছি বরাবর। তাই সব সময় হয়ত আদব কায়দা মেনে চলতে পারি না। কিন্তু সে দোষটা আমার নয় আমার অভ্যাসের।

—দোষ কে দিচ্ছে আপনাকে! কবে আসবেন আবার?

—এই তো মুস্কিল! আবার সাহস দিচ্ছেন?

—দুঃসাহস তো আপনারই আছেই। আমি একটু প্রশ্রয় দিচ্চি মাত্র।

শিশির একবার ছেলে মানুষের মত উৎসাহিতকণ্ঠে বলে ওঠে, তা দিন। আমার তরফ থেকে কোন অসুবিধা হবে না। সময় পেলেই ছুটে আসবো।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ শিশিরের উৎসাহদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে ওঃ আগে আপনাকে কি ভয়ানক গম্ভীর মানুষ বলে জানতাম। কথা কইতে পর্য্যন্ত ভয় হ'ত।

—সেই জন্যেই তো একদিন বলেছিলাম, কতটুকুই বা জানেন আমার সম্বন্ধে! শিশির হাসতে হাসতে জবাব দেয়!

উপরতলা থেকে এই সময় রায়বাহাদুরের খাস চাকরের হাঁক শোনা যায়, দারোয়ান, ড্রাইভারকে গাড়ী বা'র করতে বলো।

ঘরের মধ্যে শিশির আর সুমিত্রা দুজনেই সচকিত হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর শিশির বলে, এবার আমারও বেরিয়ে পড়া দরকার। আচ্ছা নমস্কার....

শিশির বেরিয়ে যাবার পরও সুমিত্রা আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ ঘরের

মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

রায়বাহাদুরের সঙ্গে তাকেও রোজ বেড়াতে যেতে হয়।

মাস-খানেক পরে রায় বাহাদুরের কলকাতার বাড়ীতে হঠাৎ একদিন হীরালালের আবির্ভাব। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর আসল কথায় পৌছিতে হীরালালের দেরী হয় না।

—আপনি গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পর শিশির ডাক্তারের দাপটা যেন আরও বেড়েচে। আমাদের উপরেই যত আক্রোশ, কারণ আমরা আপনার আনুগত। কিন্তু তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি আপনার নামে পর্য্যন্ত ঠেস দিয়ে কথা না বল্‌তো। স্কুল বাড়ীর কণ্ট্রাক্ট নিয়ে সেদিন মিটিংএ যা বললে তা যদি শুনতেন।

আর শুনতে পারি না হীরালাল,—রায়বাহাদুর অধৈর্য্য হয়ে বলে ওঠেন, বেছে বেছে চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারীর কি ডাক্তার না জোগাড় করেছ। একেবারে আমার জীবনের শনি হয়ে উঠলো। গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসেও শান্তি নেই।

—আজ্ঞে তখন কি করে বুঝব বলুন যে ওর ভিতর এত শয়তানী আছে! এই দেখুন না গাঁয়ে আপনার এত বদনাম করবার পরও কোন মুখে যে এ বাড়ীতে আসে তাই তো আমি ভেবে পাই না।

—কে এ বাড়ীতে আসে? শিশির ডাক্তার? কি বলছ তুমি? বিস্মিত রায়বাহাদুর যেন নিজের কাণকেই বিশ্বাস করতে পারেন না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন তো হামেশাই আসে। বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই

হীরালাল জানায়, এই তো আজই দেখে এলাম নিচে বসে সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে গল্প করচে।

রায়বাহাদুরের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে এবং হীরালাল তার পর আর সেখানে দাঁড়ান সমীচীন মনে করে না।

হীরালাল কথাটা মিছে বলে নি। রায়বাহাদুর যখন হীরালালের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তখন উপরে ওঠবার সিড়ির ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে সুমিত্রা শিশিরকে বলছিল, না, না, আজই কি দরকার। বাবার সঙ্গে দুদিন পরে দেখা করলেও চলবে।

শিশির রাজী হয় না! বলে, অত ধৈর্য্য আমার নেই। উঁহু, আর চলছে না। ওদিকে গাঁয়ের রোগীরা, এদিকে তুমি—এই দোটানার মাঝে টানা পোড়েন করতে আমি আর পারছি না।

—তা তোমার রুগীদের নিয়েই থাক না। সুমিত্রার চোখে মুখে দুষ্টুমী যেন উঠলে ওঠে।

—তা হলে আমার রোগ যে আবার সারে না। শিশির রীতিমত হতাশার ভঙ্গী করে।

—কিন্তু বাবা—সুমিত্রা যেন হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ করে।

না, না, কোন ভাবনা নেই—শিশির অভয় দেয় তোমার বাবার হার্ট আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেচি। এ রকম একটী প্রস্তাবে তাঁর হঠাৎ হার্টফেল করবার কোন সম্ভাবনা নেই।

হাসতে হাসতে শিশির সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করে। মিনিটখানেক ইতস্ততঃ করে সুমিত্রাও উপরের দিকে পা বাড়ায়।

শিশিরের পায়ের শব্দে একবার তাকিয়েই রায়বাহাদুর মুখটা ফিরিয়ে নেন। তাঁর মুখটা অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে ওঠে। শিশির এগিয়ে এসে নমস্কার জানায়। রায়বাহাদুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর মুখের চুরুট-নির্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে থাকেন।

শিশির বলে, আমাকে দেখে আপনি খুব খুসী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এবার আমি আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে আসিনি।

—আমার সময় অল্প, যা বলবার আছে বলুন! রায়বাহাদুরের কণ্ঠ তাঁর মুখের মতই গম্ভীর।

দেখুন অনেক কথাই বলব ভেবে এসেছিলাম, কিন্তু আপনার ভাব গতিক দেখে বাধ্য হয়েই ভূমিকাটা বাদ দিতে হচ্ছে। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে শিশির আবার বলে, আমার আসল কথা হ'ল—আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।

রায়বাহাদুর কোন কথা বলেন না, স্তম্ভিত ভাবে শিশিরের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

শিশির একটু অপেক্ষা করে আবার বলে, আপনার অনুমতি কি আমরা পেতে পারি?

শিশিরের পিছনে স্থমিত্রাকে এসে দাঁড়াতে দেখে রায়বাহাদুরের বিস্ময় আর ক্রোধের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বজ্র-কঠিন কণ্ঠে তিনি বলেন, শোন, এ পর্য্যন্ত চাকর ডেকে কাউকে বার করে দেবার দরকার আমার আগে কখনও হয়নি—

—আজও হবে না। রায়বাহাদুরের বক্তব্য শেষ হবার আগেই শিশির বলে, কারণ আমি নিঃশব্দে এখনি বেরিয়ে যাব এবং আপনার মেয়েকে যদি ভুল না বুঝে থাকি তা হলে সেও আমার সঙ্গে যেতে দ্বিধা করবে না।

শিশির যাবার জন্য পা বাড়ায়, সুমিত্রাও তাকে অনুসরণ করে।

রায়বাহাদুর যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেন না; মনে হয়, হঠাৎ ভূমিকম্পে ঘরের মেঝেটা দুলে উঠলেও তিনি এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'তে পারতেন না।

সুমিত্রা! রায়বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দেন।

সুমিত্রা ফিরে দাঁড়ায়। রায়বাহাদুর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন—আমি জানতে চাই এই স্কাউণ্ড্রেল, এই লোফার আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আজ যে অপমান আমায় করলে তার সাহস সে কোথা থেকে পেলে? কোন উৎসাহ সে তোমার কাছে পেয়েছে কি না?

সুমিত্রা নির্ব্বাক।

—তা হলে কি বুঝবো, আমার অনুমতি না পেলেও তুমি ওরই সঙ্গে যেতে চাও—ও-কেই বিয়ে করতে চাও?

এবারও সুমিত্রার তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বলেন, বেশ, তা হলে একথাও জেনে রাখ যে আজ থেকে আমার মেয়ে বলে কেউ নেই, আমি নিঃসন্তান, আমার সম্পত্তির এক কাণাকড়িও তুমি কোন দিন পাবে না।

রায়বাহাদুর হয়ত ভেবেছিলেন একথার পর সুমিত্রাকে অন্ততঃ দুমিনিট দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটলো না। করুণ একটু হেসে সুমিত্রা বলে, তোমার স্নেহই যখন হারাচ্ছি, তখন সম্পত্তি না পাবার দুঃখ কি তার চেয়ে বেশী হবে বাবা।

রায়বাহাদুরের পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করে সুমিত্রা শিশিরের

সঙ্গে বেরিয়ে যায়। রায়বাহাদুর যেন চীৎকার করে একবার মেয়েকে ডাকতে যান, কিন্তু পর মূহূর্তেই তাঁর মুখটা আবার কঠিন হয়ে ওঠে, বজ্রাহত বনস্পতির মত সেই শূন্য ঘরে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কলকাতা থেকে স্থমিত্রাকে নিয়ে শিশির ওঠে এসে ভূষণার বেণীমাধবের বাড়ীতে। সেখানে বেণীমাধব আর ইলার উৎসাহে স্থমিত্রার সব দুর্ভাবনা যেন এক মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে যায়। বেণীমাধবের বাড়ী থেকেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা হয় এবং বুড়ো হরিহর কম্পাউণ্ডার একাই একশো হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সেরে ফেলেন। বিয়ের রাত্রিতে ইলা তো হাসিতে, গল্পে, গানে বাসরঘর একেবারে মুখরিত ক'রে তোলে। গান শেষ করে স্থমিত্রাকে বলে, শুনলে তো গান। এখন বখশিষ দাও।

স্থমিত্রা বলে, এর আবার বখশিষ কি? এ গান ভাল নয়।

কেন? নিজেদের গায়ে লাগল বলে, না?

তা কেন, সেই গাছ থেকে যেমন গান শুনেছিলাম, এ তেমন নয়। গাছে না চড়লে তোমার গলা খোলে না বোধহয়।

বাসর শুদ্ধ সবাই স্থমিত্রার কথায় হেসে ওঠে। কিন্তু ইলা দমে যাবার মেয়ে নয়। বলে, ভাগ্যে সেদিন গাছে চড়েছিলাম, তা নইলে অমন করে পাশে বসতে আজ পেতে না।

স্থমিত্রার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। এমন সময় দেখা যায়, হরিহর আর বেণীমাধব একটু ব্যস্তভাবেই সেইদিকে আসচেন। মীরা বলে, ওই দেখ, বাবা আর হরিকাকা আবার তাড়া দিতে আসছেন।

আর তো দেরী করলে চলে না বৌদি। হরিহর বর-বউকে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বেণীমাধব মেয়েদের দিকে এগিয়ে যান।

ওরে, তোরা এবার এদের ছেড়ে দে। হরি, ব্যস্ত হয়ে উঠেচে।

হরিকাকার যেন আর তর সইছে না। আর একটু থাক না হরিকাকা।

থাকবার যে আর সময় নেই দিদি। একটু সময় ভাল থাকতে থাকতে তো বাড়ী নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে। পাঁজিটা যে বেয়াড়া—

হরিহরের কথায় বাধা দিয়ে ইলা বলে ওঠে, তুলবে গিয়ে তো তোমার সেই ডিসপেন্সারীতে, সেখানে ভাঁড়ারে থাকবে ওষুধ আর হেঁসেলে ঢুকবে রুগী। তার চেয়ে এখানেই থাকলে হোত না?

না গো, না,—হরিহর ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়, হরি কি আর সে ডিসপেন্সারী রেখেচে? একবার দেখবে চল না। শিশির আর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলেন, নাও, নাও, ওঠো এখন।

সত্যি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করচে না,—ইলা সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে,—বিয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

তা তোমার বিয়ে না হয় সাত দিন সাত রাত্তির ধরে দেওয়া যাবেখ'ন, হরিহর বলেন। ঘর শুদ্ধ সবাই হরিহরের কথায় হেসে ওঠে।

সুমিত্রা এবং শিশির উঠে দাঁড়ায়।

হরিহর বলেন, আহা টোপরটা পড়ে রইল যে, ওটা মাথায় নিতে হয়।

টোপরটা তুলে নিয়ে তিনি শিশিরের মাথায় পরিয়ে দেন।

বাবা! হরিকাকার পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। ইলা হেসে জিজ্ঞাসা করে—এত শিখলে কোথায় বলতো হরিকাকা? নিজে তো চিরকাল আইবুড়ো।

পরের বিয়ে দিতে দিতে নিজের আর বিয়ের সময় পেলাম কই!
হরিহর সুমিত্রাকে আর শিশিরকে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দেন।

খবরটা যথা সময়ে রায়বাহাদুরের কানে পৌছুলো এবং হীরালালেরই মারফতে।

—আমার শ্বশুর ওই বেণীমাধব বুড়োটি কম যান না। ঘটা করে উনিই তো নিজের বাড়ীতে বিয়ে দিলেন। তবে আমিও সব কিছুর হিসেব রেখেছি, যারা যারা এ বিয়েতে গেছলেন তাদের সকলের নাম আমি টুকে রেখেচি।

রায়বাহাদুর বলেন, এসব কথা আর আমায় শোনাতে তুমি এসো না, হীরালাল। যারা সব অনিষ্টের মূল তাদের যদি কোন দিন শায়েস্তা করতে পার, তা হলে এখানে এসে মুখ দেখিও, নইলে তোমার ও নিত্যি কাঁদুনী আমি শুনতে পারি না।

হীরালাল যেন অমনি একটা হুকুম প্রত্যাশা করছিল, তাই উৎসাহের ভাবটা গোপন রেখে বলে, আজ্ঞে, শায়েস্তা কি আর করতে পারি না, তবে হাজার হোলেও আপনার জামাই!

জামাই, জামাই!—ক্ষুব্ধ বিরক্তকণ্ঠে রায়বাহাদুর বলে ওঠেন, কে আমার জামাই? আমি কতবার তোমায় বলেছি, আমি নিঃসন্তান, আমার মেয়ে বলে কেউ নেই।

রায়বাহাদুরের কঠিন মুখের দিকে চেয়ে কথা বাড়াবার সাহস হীরালালের হয় না।

রাত অনেক হয়েচে। বৃষ্টির শব্দে চারিদিক মুখরিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক আর দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ।

দাবী

ঘরের ভিতর শিশির ডিসপেন্সারীর খাতাপত্রগুলো পরীক্ষা করছিল। বিয়ের পর এই মাস খানেকের মধ্যে নূতন গৃহস্থালী রচনার ব্যস্ততায় এসব দিকে মন দেওয়ার অবসর বিশেষ ঘটেনি।

অনেকক্ষণ ধ'রে খাতার হিসেবগুলো দেখতে দেখতে শিশিরের সমস্ত শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। খাতাখানা বন্ধ করে শিশির স্নমিত্রার দিকে চায়।

কি গো রাত কটা বাজলো খেয়াল আছে?

স্নমিত্রা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বৃষ্টির ছাট উপভোগ করছিল। শিশিরের ডাকে হাসতে হাসতে ফিরে দাঁড়িয়ে স্নমিত্রা বল্লে, খেয়ালটা তোমার এতক্ষণ ছিল কি?

আহা, আমার না হয় কাজ ছিল, তুমি ত শুতে গেলে পারতে— শিশির অনুযোগ করে।

স্নমিত্রা শিশিরের আরও কাছে এসে দাঁড়ায়; বলে, ইচ্ছে করচে না যে!

আমি কিন্তু এবার বাতি নিবিয়ে দেব,—খাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শিশির বলে।

দাও না, বেশ তো হবে।

শিশির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। স্নমিত্রার কিন্তু শুতে যাবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সে আবার সেই জানালার ধারটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। হু হু করে জলো হাওয়া ঢুকচে ঘরের ভিতর, বিদ্যুতের ঝিলিকে অন্ধকার ঘরের ভিতরটা মাঝে মাঝে আলো হয়ে উঠচে।

বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ, স্নমিত্রা যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাই বুক ভরে উপভোগ করে। শিশির ফিরে গিয়ে দাঁড়ায় স্নমিত্রার পাশটিতে।

সুমিত্রার একখানি হাত আস্তে আস্তে টেনে নেয় নিজের হাতের মুঠোয়। জিজ্ঞাসা করে, সত্যি, কি মতলব বলো তো? রাতটা কি জেগেই কাটাবে নাকি?

—কাটালেই বা দোষ কি! এমন রাত আর কটা পাওয়া যায়? ঘুমোলেই তো সব বাজে খরচ।

দুজনে ওরা দুজনের দিকে চেয়ে হাসে।

তুমি বুঝি চাও রাতটা না ফুরোয়? শিশির জিজ্ঞাসা করে।

তাই তো চাই।

সুমিত্রার চোখে-মুখে নারী-হৃদয়ের অনাদিকালের রহস্য যেন বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। সেদিকে চেয়ে শিশির যেন মুহূর্তের জন্যে কি ভাবে। তারপর দীর্ঘশ্বাস লুকোবার চেষ্টা করে বলে, আচ্ছা, সত্যি করে বল ত সুমিত্রা, এই অভাবের সংসারে সাধ করে এসে তোমার মনে কি কখন কোন আফশোষ হয় না?

আফশোষ! তা হয় বই কি,—সুমিত্রা দুষ্টুমীভরা চোখে শিশিরের মুখের দিকে চায়। শিশিরও একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকায় সুমিত্রার মুখের দিকে।

সুমিত্রা সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে বলে, আফশোষ হয়, এমন আনাড়ি হাতুড়ে ডাক্তারকে বিয়ে করলাম, যে, বুকে কল বসায়, তবু মনের কথা বোঝে না।

এবার অন্ধকারে নদীর কল গুঞ্জনের মতো ঘরের মধ্যে শোনা যায় শুধু ওদের দুজনের হাসি।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর শিশির বলে, আমার এক এক সময় কেমন ভয় হয় সুমিত্রা, এ স্বপ্ন বুঝি হঠাৎ ভেঙে যাবে।

না, না, অমন কথা বলো না,—সুমিত্রা তাড়াতাড়ি শিশিরের মুখে হাত চাপা দিতে যায়, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনে হয় কে যেন বাড়ীর বাইরের দরজায় সজোরে ধাক্কা দিচ্চে।

ওকি বলো তো? সুমিত্রা একটু শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করে।

শিশির জবাব দেবার আগেই বাইরের দরজায় ধাক্কাটা যেন আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সুমিত্রার এবার বুঝতে বাকী থাকে না যে, কেউ ডাকতে এসেচে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

সুমিত্রার মুখখানি তুলে ধ'রে শিশির বলে, ছিঃ সুমিত্রা, ডাক এলেই যেতে হবে। যেদিন থেকে ডাক্তার হয়েচি, সেদিন থেকে তো আর নিজের মালিক নিজে নই।

শিশির এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। কাপড়টা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তুলে ছাতার মধ্যে গুটিগুটি মেরে হরিহরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বোঝা যায় যে, সত্যিই কোথাও থেকে 'কল' এসেচে।

কি খবর হরিকাকা? শিশির জিজ্ঞাসা করে।

রতন গাঁ থেকে কারা নাকি ডাকতে এসেচে। হার্টের অসুখ, ভয়ানক জরুরী ডাক, এখুনি নাকি না গেলে নয়। একটু চুপ করে থেকে হরিহর আবার বলেন, কি বলবো, কাল সকালে আসতে?

না, না, বলুন গে আমি এখুনি যাচ্চি।

রতন গাঁ কতদূর হরিকাকা? সুমিত্রা জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

তা বেশ দূর। এ গাঁ ছাড়িয়ে বনবাদাড় ভেঙে দুক্রোশের কম তো নয়।

সত্যি কি না গেলে নয়? সুমিত্রা এবার কাতরভাবে শিশিরের মুখের দিকে চায়, বলে, মুখ্যু গাঁয়ের লোক, মিছিমিছি কত ভয় পায়। হয়ত সামান্য অসুখ, কাল সকালে গেলেও চলবে।

শিশিরকে কিন্তু নিরস্ত করা যায় না।

কি ছেলেমানুষী করছ সুমিত্রা! রাত্রে রুগী দেখতে আগেও ত কতবার গিয়েছি।

কথাটা সত্যি, কিন্তু আজ যেন সুমিত্রার মন কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে পড়ে।

শিশিরের কাছে গিয়ে প্রায় অনুচ্চারিতকণ্ঠে সুমিত্রা বলে, আজ আমার মনটা কেমন কোরচে!

আলনা থেকে কোটটা পাড়তে পাড়তে শিশির বলে, ও তোমার মনের ভুল। তোমার কিছু ভয় নেই। হরিকাকা বাইরে ডিস্‌পেন্সারীতে রইলেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো—

হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে শিশির বেরিয়ে যায়, আর স
জানালার কাছে ফিরে এসে শূন্য-দৃষ্টি দিয়ে ঝড়ের স
দেখে।

শিশিরের রতন-গাঁয়ে পৌছতে রাত একটা বে
এক জরাজীর্ণ চালাঘরের মধ্যে প্রদীপের আ
ঘরের মধ্যে তাকে রুগী দেখতে নিয়ে যাওয়া
উপর শুয়ে রুগী, আশপাশে তিন চারজন লে

ভাল করে রুগীর বুক-পিঠ পরীক্ষা ক
নতুন নয়, অনেক দিনের দেখচি। রে
আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ বছর পাঁচেক এইর

—তা এই রাত্রে হঠাৎ সাত
ছিল? দিনের বেলায় ডাকলে
ভাবেই কথাগুলো বলে।

রুগীর

আজ্ঞে, কি করবো বলুন, হঠাৎ একেবারে নাড়ী ছাড়বার মত অবস্থা! মনে হ'ল এখুনি বুঝি যায়!

এ রকম তো আগেও হয়েচে, তখন করেছেন কি? কই কোনদিন ডাকেননি তো? শিশির জানতে চায়।

আজ্ঞে, ডাকব কি করে! সেই লোকটাই আবার জানায়, এ গাঁয়ে তো থাকেন না। আজ সকালে সবে কুটুমবাড়ী থেকে এসেই এই হাঙ্গামা।

প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে শিশির জিজ্ঞাসা করে, নাম?

আজ্ঞে বেণীমাধব রায়—রোগী নিজেই জানায়।

কি বল্লেন?

ণীমাধব রায়—রোগী আবার বলে।

পশান লেখা শেষ করে শিশির বলে, শুনুন একটা বড়ি

বে বাড়াবাড়ি হবে, তখন এর একটা জলে গুলে খেতে

য় নয়, বুঝেচেন? এ ছাড়া একটা মিক্সচারও

সুরু করে।

ন ভূষণায় ফিরে এল, তখন ভোর

মোয়নি, বিছানায় শুয়ে কি একটা

মিছিমিছি কি ভয়টা

এলাম,

কিছু হলো? তবে এমন চমৎকার রাতটা মাটি হলো. এই যা দুঃখ।

সত্যি, কেন হঠাৎ মনটা এমন করে উঠেছিল, কে জানে! বিছানা থেকে উঠে সুমিত্রা শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

যাক, সশরীরে যখন ফিরে এসেছি, তখন ত আর ভাবনা নেই। শিশির ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দেয়। চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করে একটু। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম আসবার আগেই হঠাৎ হরিহর এসে হাজির হন—প্রায় ছুটতে ছুটতে!

—শিগগির চলো, সর্ব্বনাশ হয়েচে। বেণীদা কাল রাত্রিতে মারা গেছেন।

—বেণীমাধব বাবু! শিশির আর সুমিত্রা প্রায় এক সঙ্গে বলে ওঠে!

—হ্যাঁ, কাল রাত্রে হঠাৎ নাকি হার্টফেল করে। এইমাত্র খবর পেলাম।

শিশির বিছানা থেকে উঠে আবার কোটটা গায়ে চড়াতে সুরু করে। সুমিত্রাও আলনা থেকে একটা চাদর টেনে নিয়ে গায়ে চড়িয়ে শিশিরের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

বেণীমাধবের বাড়ীর সামনে পৌঁছে শিশির দেখে, বারান্দার সামনে রীতিমত জটলা সুরু হয়েচে। আরও কয়েকজনের মধ্য থেকে হীরালাল বলে ওঠে, এই যে শিশিরবাবু এসেচেন, আপনারই অপেক্ষা করেছিলাম আমরা।

আমার অপেক্ষা করছিলেন? শিশির আশান্বিত হয়ে ওঠে,

এখনও—এখনও তা হলে কি প্রাণ আছে? শিশির ভিতরের দিকে এগোয়।

দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই। ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই আর। কাল রাত্রেই ঘুমের মধ্যে কখন কাবার হয়ে গেছেন, আজ সকালে ডেকে তুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সব ঠাণ্ডা। হীরালাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার সঙ্গীদের দিকে তাকায়।

মর্ম্মাহত শিশির মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। তারপর যেন আপন মনেই বলে, হার্ট ওর খারাপ ছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এ রকম হবে ভাবতে পারিনি।

ভাবতে যে আমরাও পারচি না, মশাই। এত সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

আমি একবার দেখি তবু—সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে শিশির ভিতরের দিকে এগোয়। কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়ে হীরালাল বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখবেন বইকি। আপনার নিজের একবার দেখা বিশেষ দরকার।

শিশির আর সুমিত্রা ভিতরের দিকে যেতেই হীরালাল দারোগাকে ডেকে চুপি চুপি কি যেন বলে। দারোগাবাবু নিকটেই অপেক্ষা করছিলেন।

ভিতরে পৌছে শিশির এবং সুমিত্রা দেখে, বেণীমাধবের মৃতদেহ খাটের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে রাখা আছে;—আর ইলা, মীরা এবং বাড়ীর আর দু একজন তারই চারিপাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখেই ইলা যেন কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ে—কি হ'ল শিশিরদা!

শিশির সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষাই খুঁজে পায় না। নিঃশব্দে খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বেণীমাধবের দেহটা একবার পরীক্ষা করে!

কি দেখলেন ডাক্তারবাবু? পিছন থেকে হীরালালের কণ্ঠ শোনা যায়।

না, কোন আশাই নেই, কাল শেষরাত্রেই মারা গেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য্য! মীরার দিকে চেয়ে শিশির জিজ্ঞাসা করে, কাল শরীর কিছু বেশী খারাপ হয়েছিল?

না, খুব ভালই তো ছিলেন, মীরা জানায়—আপনি যে ওষুধটা রাত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা খাইয়ে আমরা চলে যাই। তারপর আজ সকালে—

আমি কাল রাত্রে ওষুধ পাঠিয়েছিলাম! শিশির যেন ব্যাপারটা ঠিক ধারণা করতে পারে না।

পাঠিয়েছিলেন বইকি, ডাক্তারবাবু! হীরালাল এবার শিশিরের সামনে এসে দাঁড়ায়, এর মধ্যে ভুলে গেলেন নাকি?

হীরালালের কথার উত্তর না দিয়ে শিশির ছোট টেবলটার কাছে গিয়ে ওষুধের শিশিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে যায়। হীরালাল শিশিটা শিশিরের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে, থাক, থাক, ডাক্তার বাবু, এগুলো এখন আর নাড়াচাড়া করবেন না, পুলিশের কোন্‌টা কি কাজে লাগে, তাতো বলা যায় না!

চাকরটার দিকে চেয়ে হীরালাল আবার বলে, ওরে দারোগাবাবুকে একবার ভেতরে আসতে বল্‌।

দারোগা! পুলিশ! আপনি—স্তম্ভিত শিশির কি বলবে ঠিক করতে পারে না।

আজ্ঞে, বুঝতে পারছি, কথাগুলো আপনার ভাল লাগচে না। কিন্তু কি করবো বলুন, হাজার হোক নিজের শ্বশুর তো বটে। তাঁর এ রকম ভাবে মারা যাওয়াটার একটু তদন্ত না করে তো পারি না।

কর্ত্তব্য পালনের তাগিদে হীরালাল যেন অস্থির হয়ে ওঠে। শিশির কোন কথা বলবার পূর্ব্বে দারোগা এসে দাঁড়ান ঘরের ভিতরে।

আমায় ক্ষমা করবেন। নেহাৎ কর্ত্তব্যের খাতিরেই এরকম অবস্থায় আপনাদের আমায় কষ্ট দিতে হচ্ছে।

হীরালালের দিকে চেয়ে দারোগাবাবু বলেন, প্রেস্‌ক্রিপশানটা কি ডাক্তারবাবুকে আপনি দেখিয়েছেন, হীরালালবাবু?

—না, আপনি দেখান না।

দারোগা প্রেসক্রিপশানটা শিশিরের সামনে মেলে ধরেন, দেখুন তো এটা আপনারই লেখা কি না?

হ্যাঁ, আমারই লেখা।—প্রেস্‌ক্রিপশানটার দিকে চেয়ে শিশির সেকথা অস্বীকার করতে পারে না।

তা হলে বাধ্য হয়ে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হবে, ডাক্তারবাবু। দারোগা শিশিরকে বলেন, এ লাশ আমি পোষ্ট মর্টেমে পাঠাচ্ছি আপনাকে থানায় গিয়ে একটা এজাহার দিতে হবে।

এতক্ষণে যেন দারোগার প্রকৃত বক্তব্য বোঝা যায়! ঘরের মধ্যে সবাই স্তব্ধ! বিস্ময়ে এবং বেদনায় কেউ যেন কথা বলবার ক্ষমতা খুঁজে পায় না। কেবল সুমিত্রা একবার হীরালালের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠে, হীরালালবাবু!

মনে হয়, সুমিত্রা যেন এই অল্পসময়ের মধ্যেই অনেক কিছুর অনুমান করে নিয়েচে!

কিন্তু হীরালাল প্রায় নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দেয়, আমি কি করবো বলুন।

সুমিত্রার কিন্তু বুঝতে কিছু বাকী থাকে না। সেইদিনই সে কলকাতায় রায়বাহাদুরের বাড়ীতে এসে হাজির হয়, মান, অভিমান, দ্বিধা-সঙ্কোচ কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না।

রায়বাহাদুর কিন্তু সমস্ত কথা শুনেও চুপ করে থাকেন। মেয়ের অনুরোধ, চোখের জল কিছুই যেন তাঁর মর্ম্মস্পর্শ করে না। শেষ পর্য্যন্ত সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, তা হলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, এ সব হচ্ছে শত্রুর ষড়যন্ত্র!

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে তো কিছু আসবে যাবে না। রায়বাহাদুর নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেন, আদালত শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে যা বিশ্বাস করবে, সেইটাই হবে আসল। তবে তুমি যদি চাও আমি বরং তার জন্যে ভাল একজন উকীল দাঁড় করবার খরচ দিতে পারি।

থাক বাবা, তার দরকার হবে না। সুমিত্রা এবার উঠে দাঁড়ায়। তার এত বড় বিপদের মুহূর্ত্তে বাবার এই নির্ম্মম ঔদাসিন্য সত্যিই সে কল্পনা করতে পারে নি। তা ছাড়া তার মনে মনে এইটুকু আশা অন্ততঃ ছিল যে, তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে, রায়বাহাদুর অনায়াসেই শিশিরকে নিরপরাধ বলে মেনে নেবেন এবং হীরালালের দলকে এই অপচেষ্টায় ক্ষান্ত করবার জন্য তার সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করবেন। রায়বাহাদুরের কাছে এই আঘাত পেয়ে চরম বেদনায় তার মন তাই একেবারে কঠিন হয়ে ওঠে।

কেন, এতে আপত্তি করবার তোমার কি আছে? রায়বাহাদুর প্রশ্ন করেন।

আহতকণ্ঠে সুমিত্রা বলে, অনেক কিছু আছে বাবা। এক-দিন তুমি রাগের মাথায় বলেছিলে যে, তোমার মেয়ে বলে কেউ নেই। আজ আমি সে কথা সত্যি বলে মেনে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

রায়বাহাদুর তাকে বাধা দেবার আগেই সুমিত্রা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পুলিশ শিশিরকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রে যথারীতি মামলা সোপর্দ্দ করে। তারপর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যেদিন মামলা ওঠে, সেদিন আদালতে হীরালাল থেকে আরম্ভ করে আরও অনেককেই দেখা যায়। পাবলিক্ প্রসিকিউটার মামলা বোঝাতে উঠে বলেন, আসামীর নিজের হাতের সই করা প্রেস্‌ক্রিপশানের পর এই অপরাধের আর কি বড় প্রমাণ থাকতে পারে? এই প্রেস্‌ক্রিপশানই ডাক্তার শিশির রায়ের অপরাধের জলন্ত প্রমাণ, নিজের বিরুদ্ধে তার নিজের হাতে লেখা অকাট্য সাক্ষ্য। এত বড় প্রমাণ কেন সে নির্ব্বোধের মত মজুত রেখে দিয়েছিল, কেন, সে সময় মত এটা নষ্ট করে ফেলেনি, তা' যদি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলবো, নষ্ট করবার অবসর তাকে দেওয়া হয়নি। মৃত বেণীমাধবের বাড়ীতে বিশ্বস্ত ডাক্তার হিসাবে তার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তার ধারণা ছিল, তার চাতুরী কোনদিন ধরা পড়বেনা। সময় মত নিজের পৈশাচিক কীর্ত্তির প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে তাকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে

হবে না। কিন্তু একটি লোকের সজাগ তৎপরতায় ডাক্তারের সব হিসেব উল্টে গিয়েছে। বেণীমাধবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেখানে গিয়ে পড়ে বাধা না দিলে, আজ সাধারণ হৃদরোগে মৃত্যু বলে অনায়াসে আসামী তার কীর্ত্তি চালিয়ে দিতে পারত……

সরকারী উকিলের যুক্তি এবং ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে হীরালালের চোখ মুখ যেন পৈশাচিক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে!

ম্যাজিষ্ট্রেট শিশিরকে দায়রা সোপর্দ্দ করলেন।

শিশিরের পক্ষ থেকে প্রধানতঃ হরিহরের চেষ্টায় একজন উকীল খাড়া করা হয়েছিল। দায়রা আদালতে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হবার পর, আসামী পক্ষ থেকে বলা হল, প্রেসক্রিপশান যে শিশির রায়ের নিজের হাতের লেখা সে কথা আমরা অস্বীকার করিনা। বেণীমাধব রায়কে যে হত্যা করা হয়েচে এ কথাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু হত্যাকারী, ডাক্তার শিশির রায় নয়। তিনি শুধু একটা পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের অসহায় শীকার মাত্র। যারা সেই দুর্যোগের রাতে তাঁকে মিথ্যা কল্ দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, নিজেদের প্রয়োজন মত নকল রুগী সাজিয়ে যারা সেদিন তাঁর হাত দিয়ে বেণীমাধব রায়ের নামে প্রেসক্রিপশান লিখিয়ে নিয়েছিল, তারাই বেণীমাধব রায়ের আসল হত্যাকারী।

সরকারপক্ষে কৌশুলী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়োর অনার, একটা কথা আমি শুধু আমার বিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। সেদিন দুর্য্যোগের রাতে ডাক্তার শিশির রায় যার চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন, সেই নকল বেণীমাধব রায়কে তিনি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করতে রাজী আছেন কি?

আসামীর পক্ষের উকীল জানান, না, তাকে আমরা এখানে উপস্থিত

করতে পারিনা। তাকে সেই রাত্রের জন্য যারা সংগ্রহ করে এনেছিল, সেই ষড়যন্ত্রকারীর দলই আবার সরিয়ে দিয়েছে গ্রামে ; তার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই নেই।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী বলেন, আমিও তো শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমার বিজ্ঞ বন্ধুর কল্পনায় ছাড়া সে রোগীর কোন অস্তিত্ব নেই। একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে তিনি আবার সুরু করেন : কিন্তু আমরা এখানে কাল্পনিক কাহিনী শুনতে আসিনি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সাক্ষ্যই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার উপকরণ। প্রেস্‌ক্রিপশানের হস্তাক্ষর যে শিশির ডাক্তারের নিজের একথা যখন স্বীকার করেই নেওয়া হয়েচে···

সরকারপক্ষের কৌঁসুলীর জেরায় সুমিত্রাকে স্বীকার করতে হয় যে, বাবার মতের বিরুদ্ধেই সে স্বেচ্ছায় ডাক্তারকে বিবাহ করেছিল এবং বাবার আশ্রয় ছেড়ে স্বেচ্ছায় গ্রামে চলে গিয়েছিল।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলী আবার জেরা করেন, আপনার বাবা চুণীলাল চৌধুরী যে কতখানি কঠিন প্রকৃতির লোক, তা বোধহয় আপনার স্বামী জানতেন না, কেমন? তখন তাঁর বোধহয় আশা ছিল যে একমাত্র কন্যাকে রায়বাহাদুর একদিন বাধ্য হয়েই ঘরে ফিরিয়ে নেবেন ?

আসামীপক্ষের কৌঁসুলী আপত্তি করেন ; বলেন, আমি এসব প্রশ্নে আপত্তি জানাচ্ছি। এ প্রশ্ন এ মামলায় অবান্তর।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলী কিন্তু নিরস্ত না হয়ে তাঁর বক্তব্যটা আরও ফেনিয়ে তোলেন। ইয়োর অনার, আমি এইটুকুই বোঝাতে চাই যে গোড়া

থেকেই আসামীর সব কাজের মূলে আছে অর্থের প্রচণ্ড লালসা। সেই লালসাতেই সে রায়বাহাদুরের একমাত্র কন্যাকে আদর্শ জনসেবকের অভিনয়ে মুগ্ধ ক'রে বিবাহ করবার চেষ্টা করে ও সফল হয়। কিন্তু রায়বাহাদুরের অটলতায় তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এখানে ব্যর্থ হয়ে সে বেণীমাধবের সম্পত্তির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। বেণীমাধবও তার মহানুভবতার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের সম্পত্তির একমাত্র ট্রাষ্টি করে দিয়েছিলেন। সে সম্পত্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হস্তগত করবার লোভে, বিশেষ করে পাছে বেণীমাধব দুদিন বাদে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার হাত থেকে এ অধিকার ফিরিয়ে নেন, এই ভয়ে সে অবিলম্বে তাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবার আয়োজন করে।

এক মিনিট দম নিয়ে কৌসুঁলী আবার বলেন, বহুকাল-যিনি হৃদরোগে ভুগচেন, একজন ডাক্তারের পক্ষে তার হৃদস্পন্দন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়; সামান্য একটু ওষুধের মারপ্যাচ—

সুমিত্রা আর চুপ করে থাকতে পারে না, বিকার গ্রস্তের মত চীৎকার করে ওঠে, না, না, এসব মিথ্যে। এসব তোমাদের ষড়যন্ত্র।

আদালত কক্ষের সবাই একবারে আশ্চর্য্য হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকায়, অনেক এগিয়ে তার চারিপাশে ভিড় করে। দর্শকদের আসন থেকে রায়বাহাদুরও যেন একটু ব্যস্ত আর উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান আবার খানিক পরেই কি ভেবে বসে পড়েন।

আদালতের রায়ে শিশিরের প্রতি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল।

রায় শুনে হরিহর আর সুমিত্রা যখন পাংশু, বিবর্ণ মুখে আদালত থেকে বাহিরে এসে দাঁড়ায়, তখন হীরালাল আর রায়বাহাদুরকে আরও কয়েক জনের সঙ্গে সেইদিকে আসতে দেখা যায়।

হীরালাল, বেশ উৎফুল্ল মুখে বলতে থাকে, হেঁ, হেঁ, বাছাধন এখন বুঝতে পারচেন কোন হাটে ছুঁচ বেচতে এসেছিলেন। আরে জলে বসে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করবি তুই? অত যখন তেল হয়েছিল, তখন দশটি বছর ঘানি ঘোরাও, সব তেল বেরিয়ে যাবে। কি বলেন রায়বাহাদুর?

রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে সে বিজ্ঞ ভাবে হাসতে থাকে এবং আরও কয়েকজন সে হাসিতে যোগ দেয়। কিন্তু রায়বাহাদুর তাদের হাসিতে যোগ দিতে পারেন না। মনে হয়, তাদের কোন কথাই তার কাণে যায় নি, তিনি সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবচেন। হীরালালের দল কিন্তু নিজেদের আনন্দে মশগুল, তারা রায়বাহাদুরের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখাও দরকার মনে করে না। ওরা যখন এমনি ভাবে নিজেদের হাসি-তামাসায় ব্যস্ত রায়বাহাদুর তখন ওদের এড়িয়ে নিঃশব্দে অন্যদিকে এগিয়ে যান।

রায়বাহাদুরকে আসতে দেখে হরিহর আশ্চর্য্য হয়ে থমকে দাঁড়ান। সুমিত্রাও এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রায়বাহাদুরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, চলো হরিকাকা, আমরা যাই।

হরিহর এবার রায়বাহাদুরের মুখের দিকে একটা জালাভরা দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে সুমিত্রাকে নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রায়বাহাদুর সাগ্রহে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সুমিত্রা কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জবাব দেয়, সত্যি যদি কোনদিন ভুলতে পারি, তা হলে তোমার বাড়ী ফিরে যাব বাবা।

সুমিত্রার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর আর কোন কথাই বলতে পারেন না। হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রা এগিয়ে যায়। আর রায়বাহাদুর আদালত প্রাঙ্গণে হাজার রকম মানুষের ভিড়ের মধ্যে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই আদালত, মানুষের ছুটোছুটি সব তাঁর কাছে অর্থহীন নিষ্ঠুর তামাসা বলে মনে হয়!

হরিহরই শেষ পর্য্যন্ত সুমিত্রার একমাত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নিতান্তই সামান্য নিজের খরচই জোগাতে হয় অতিকষ্টে, অপরের খরচ তিনি জোগাবেন কি করে?

তবু সুমিত্রার যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। একটি চালাঘর ভাড়া নিয়ে তাকে এনে তুললেন সেই ঘরটিতে, ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে একজন ঝি পর্য্যন্ত রাখা হ'ল। কিন্তু যে সংসারে নিজেদের পেটচলা দুঃসাধ্য, সেখানে একজন ঝি পোষা যে কত বড় কঠিন ব্যাপার সেটা হরিহরের মাথায় না ঢুকলেও সুমিত্রা কয়েক মাস যেতে না যেতেই বুঝতে পারে। তাই একদিন সকালে সুখোর মা কাজে আসতেই, সুমিত্রা বলে উঠে, সত্যি সুখোর মা, আর তোমায় আমি রাখতে পারব না!

—কেন বলো তো মা? কোন কাজটা কি আমি খারাপ করেছি?

হাতের ঝাঁটাগাছটা মাটিতে রেখে সুখোর মা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়, ওই হরে কম্পাউণ্ডার আমার নামে লাগিয়েছে বুঝি? আচ্ছা, মিনষেকে আজ দেখাচ্ছি।

সুমিত্রা বলে, না, না, হরিকাকা তোমার নামে কিছু লাগায়নি। আর লাগাবেই বা কেন? তুমি তো কোন দোষ করনি। আসলে আর মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই বলে তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্চি। দেখচ ত আমার অবস্থা, এই খোলার ঘরের ভাড়াই যে কোথা থেকে দেব তা জানিনা।

সুমিত্রা কথাটা মিছে বলেনি। কারণ শিশিরের সঞ্চিত যা কিছু তা মামলার তদ্বির করতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে ঘুষ হিসেবে গেছে সুমিত্রার গায়ের ভারী গহনাগুলো।

সুখোর মার কিন্তু সে সব খোঁজে দরকার নেই। সে এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, ছেড়ে ত আমায় দিচ্চ, কিন্তু আমি যাব কোথায় শুনি? এই বাজারে কে আমায় চাকরী দেবে?

—চাকরী তুমি অনেক পাবে সুখোর মা, তোমার মত বিশ্বাসী, খাটিয়ে লোক কটা মেলে?

সুমিত্রার এতবড় সার্টিফিকেটও সুখোর মাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সে বলে, সেই সঙ্গে এমন মুখের ধারাও যে মেলে না মা। কে আমার এই কাট্‌কেটে কথা শুনে আমায় আদর করে রাখবে? বলো তো কোনখানে দুদিনের বেশী কি আমি টিকতে পেরেচি?

সুমিত্রা কি যে জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

সুখোর মা যেন নিজের মনেই বলতে থাকে, না, না, তোমায় বলে রাখচি মা, হুট্‌হাট্ করে যখন তখন আমায় যাও যাও বলবে না। পেটের দায়ে ঝি-বৃত্তি করি বলে কি আমার মান অপমান নেই!

সুমিত্রা আর কিছু বলবার আগেই হরিহরকে আসতে দেখা যায়—পিছনে কুলীর মাথায় একটা সেলাইয়ের কল। কলটা দাওয়ার ওপর নামাতে বলে কুলীর হাতে হরিহর একটা দু' আনি দেন!

খালি দো আনা? কুলীটা একটু অপ্রসন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে।

দো আনা নয় তো কি একটা সেলাইয়ের কল বয়ে এনেছো বলে তোমায় রাজত্বি দেব! যা, যা, সরে পড়।

হরিহর দাওয়ার প্রান্তে বসে পড়ে, চাদরের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলেন, ওই নাও মা, যা হুকুম করেচ এনেচি। কিন্তু শেষ সম্বল ওই কগাছা চুড়ি বেচে এ কল কেনার কি যে দরকার ছিল তা এখনও আমি বুঝলুম না। এ সেলাইয়ের কল চালিয়ে কত রোজগার হবে তাও জানি না।

যাই হোক, ভিক্ষে করার চেয়ে তো ভাল হবে, সুমিত্রা বলে।

কিন্তু একাজ কি তোমার সাজে! কথা বলতে বলতে হরিহরের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে, চিরদিন যে রাজঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ, এমন খাটুনী তার কদিন সইবে! কোথা থেকে তোমায় এই ভাঙা কুঁড়েয় টেনে এনেচি—ভাবতেই আমার বুক ফেটে যায়।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলে, তা হলে সব ভুলে গিয়ে মাথা হেঁট করে সেই রাজঐশ্বর্য্যের মধ্যে কি তুমি ফিরে যেতে বল হরিকাকা?

হরিহর কি জবাব দেবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না। সুমিত্রা যেন আপন মনেই বলে, না, হরি কাকা, পারলে সেখানে অনেক আগেই যেতাম। টাকার অভাবে প্রীভিকাউনসিলে মামলার আপীলও আজ বন্ধ হয়ে থাকতো না। তিনি বিনা দোষে এত বড় অপবাদ নিয়ে জেল খাটচেন জেনেও যা পারিনি, নিজের সুখের জন্য তাই করব মনে কর!

সুমিত্রার চোখে জল এসে পড়ে। সেটা লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে।

হরিহর এবার সুখোর মার দিকে চেয়ে বলেন, কি যে হবে সুখোর মা আমিও কিছু বুঝতে পারচি না। মার এ বুক-ভাঙ্গা পণ সে টলবার নয়, অথচ ওইতো শরীরের অবস্থা।

তাই ত ভাবচি! সুখোর মা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, এই দুঃখের দিনে পেটে যেটা এসেচে, তার জন্যেই যে আরও বেশী ভাবনা। বড় জোর আর তিনটে মাস বইতো নয়। তার পর কেমন করে যে কোনদিক রক্ষে হবে তা ভেবে পাইনা!

খানিকটা চুপ করে থেকে সুখোর মা যেন নিজের মনে গর্‌গর্‌ করতে থাকে, মুখ পোড়া বিধেতা কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। এমন দেবতার মত মনিব আমাদের মিনিদোষে সাজা পাবে, আর যে সত্যিকার খুনে, বদ্‌মাস পাষণ্ড, সে করবে রাজ-ঐশ্বর্য্য ভোগ! এই কি বিধেতার বিচার। নুড়ো জেলে দিতে হয় না বিধেতার মুখে!

হরিহর ম্লান একটু হেসে বলেন, অমন কথা বলতে নেই সুখোর মা। বিধাতার বিচার ঠিকই আছে। তবে তাঁর সাজা যে কোনদিক দিয়ে কখন্‌ আসে কেউ জানে না!

বেণীমাধবের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবার পর হীরালাল তাঁর বাড়ীতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। বেণীমাধব যে ঘরগুলো যন্ত্রপাতিতে ভরিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো খালি করে নিজে মনোমত ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার একটা কল্পনাও তার মাথায় উঁকি মারছিল। বোধ করি সেই

কল্পনা কাজে পরিণত করবার জন্যই সেদিন সে কারখানার ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকে, কোন্ জিনিষগুলো আগে বিদায় করা দরকার মনে মনে তারই একটা হিসাব করছিল। সঙ্গে ছিল আরও দু'চার জন লোক। এমন সময় গম্ভীর মুখে ইলা এসে দাঁড়াল ঘরে মধ্যে।

ইলার দিকে চোখ পড়তে হীরালাল বল্লে, কি ব্যাপার গো ইলাদেবী, মুখখানা যে মেঘের মত ভার!

আপনি নাকি এখান থেকে বাবার সব কলকব্জা সরাবার ব্যবস্থা করচেন? ইলা জিজ্ঞাসা করলে!

তা সরাতে হবে না! ও সব জঞ্জাল রেখে লাভ কি?

হীরালাল অনায়াসে কথাটা বললেও ইলা সেটা মোটেই সহ্য করতে পারলে না; বল্লে, বাবার এই সব প্রাণের জিনিস আপনার কাছে জঞ্জাল। বাবার সমস্ত লুট করে খেয়েও আপনার সাধ মিটচে না, তাঁর স্মৃতি টুকুরও অপমান করতে চান!

ছোট মুখে পাকামি ভাল লাগে না ইলা, হীরালাল রীতিমত ধমক দিয়ে উঠল, বাবার স্মৃতির জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি এখান থেকে যাও।

ইলার যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, হীরালালের দিকে এগিয়ে এসে দীপ্ত কণ্ঠে বল্লে, না, বাবার এসব জিনিস আপনি সরাতে পারবেন না! এক টুকরোও না।

হীরালাল অত সহজে নিরস্ত হবার পাত্র নয়; এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে বল্লে, তোমার আস্পর্দ্ধা বড় বেড়েচে ইলা। আদর দিয়ে শ্বশুর মশায় তোমার মাথাটি খেয়েচেন। কিন্তু তোমার মতন বেয়াড়া মেয়েকে কি করে ঢিট্ করতে হয় তা আমি জানি। তোমার বাবার মত আমায় আহাম্মুখ ভেবনা।

হীরালালের কথাগুলো ইলার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, আমার বাবার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে, তাঁর পয়সা খেয়ে তাঁকেই আপনি আহাম্মুখ বলেন! যান দূর হয়ে যান এখান থেকে। এ সব জিনিস সরাবার কোন অধিকার আপনার নেই—অসহায় আক্রোশে ইলা যেন ফুলতে লাগল।

অধিকার আছে কিনা দেখাচ্চি। আগে এই সব জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে তোমার বাবার পিণ্ডির ব্যবস্থা করি—হীরালাল সঙ্গের লোকগুলির দিকে চেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, কি দেখচিস হাঁ করে দাঁড়িয়ে, সরা! নিয়ে যা সব সরিয়ে।

লোকগুলো ভয়ে ভয়ে একবার হীরালাল আর একবার ইলার দিকে তাকালে। যন্ত্রপাতিগুলো সরাবার জন্য হাত বাড়ায় এমন সাহস তাদের নেই।

বেণীমাধবের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এই জিনিসগুলো অপরে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে এ দৃশ্য ইলা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, খবরদার যেই এ সবে হাত দিয়েচিস্ তো হাত কেটে দেব! দেখি কে এতে হাত দেয়।

ইলার সে উগ্র মূর্ত্তির দিকে চেয়ে লোকগুলো পিছিয়ে আসে।

রাগে হীরালালের আর জ্ঞান থাকে না।

কে হাত দেয়! আয় ব্যাটারা, দূর করে দে সব—হীরালাল এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো ধরে টানতে সুরু করে। একটা যন্ত্র নিয়ে টেনে ফেলে দেয় দূর, তারপর আর একটা—হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যায় যা এতক্ষণ কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

টানাটানির মধ্যে কতকগুলো ভারি ভারি কলকব্জা হুড়মুড় করে এক সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়ে একেবারে হীরালালের মাথার ওপর! ভীষণ একটা আর্ত্তনাদ করে হীরালাল লুটিয়ে পড়ে সেই কলকব্জাগুলোর তলায়, আর মিনিটখানেকের মধ্যে টকটকে তাজা রক্তের স্রোত বইতে থাকে মেঝের ওপর।

স্তম্ভিতের মতো এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে ইলা চীৎকার করে ওঠে। সরিয়ে আনো, শিগগির সরিয়ে আনো।

লোকগুলো ভারি কলকব্জার তলা থেকে, হীরালালকে টেনে বার করবার চেষ্টা করে। ইলা ছুটে যায় বাড়ীর ভিতরে জলের সন্ধানে। যেতে যেতে বলে, ডাক্তার···ডাক্তারকে খবর দাও।

অনেক কষ্টে লোকগুলি হীরালালকে যন্ত্রপাতির তলা থেকে বার করে তার শোবার ঘরে নিয়ে এসে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। কিন্তু রক্তের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হ'তে চায় না, হীরালাল অচৈতন্যের মত বিছানায় পড়ে থাকে। মীরা দাঁড়িয়ে থাকে হীরালালের মাথার শিয়রে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে, একটা কথা পর্য্যন্ত বলবার শক্তি সে খুঁজে পায় না নিজের মনের মধ্যে।

খানিক পরেই ডাক্তার এসে পড়েন।

ক্ষতস্থল পরিষ্কার করে, ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ডাক্তার যখন উঠে দাঁড়ান মুখ তাঁর রীতিমত গম্ভীর।

ঘরশুদ্ধ সবাই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সাবান জল দিয়ে হাত ধুতে ধুতে ডাক্তার বলেন, এখন ওকে ঠিক

এই অবস্থায় থাকতে দিন, মোটে যেন নাড়াচাড়া করা না হয়। আমি একটু পরে এসে একটা ইন্‌জেকশান দিয়ে যাব।

মীরা আর চুপ করে থাকতে পারে না,—ডাক্তারের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি করে বলুন ডাক্তারবাবু, কোন আশা আছে কি ?

খানিক চুপ করে থেকে ডাক্তার জবাব দেন, আমাদের সাধ্য আর কিছু নেই, এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

বুঝেছি—অশ্রুর আবেগ রোধ করতে না পেরে মীরা এবার খাটের এক প্রান্তে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। বোধকরি তার কান্নার শব্দে সচেতন হয়ে হীরালাল চোখ মেলে চায়। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত খানিক চুপ করে চেয়ে থেকে ডাক্তারের দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, একবার এদিকে শুনে যাও।

সবাই আশ্চর্য্য হয়ে হীরালালের মুখের দিকে চায়।

ডাক্তার খাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, না, না, আপনি নড়বেন না।

না, আমি নড়বো না, হীরালাল কোন রকমে নিশ্বাস ফেলতে পারে কিন্তু একটা কথা বলতে পার ডাক্তার। আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবো ?

ওসব কি বলচেন ? ভাল হয়ে উঠবেন আপনি—ডাক্তার স্তোকবাক্য উচ্চারণ করেন।

মিথ্যে স্তোক আমায় দিওনা ডাক্তার ! হীরালাল ক্ষীণ একটু হাসবার চেষ্টা করে, আমি জানি এই আমার শেষ ! কিন্তু তবু আর কয়েক ঘণ্টা আমায় বেঁচে থাকতেই হবে ডাক্তার, আমায় রায়বাহাদুরের কাছে পৌছতেই হবে।

ঘরের মধ্যে সবাই বিস্ময়ে নির্ব্বাক। শুধু ডাক্তার বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, কি বলচেন আপনি, সেত এখান থেকে চার ঘণ্টার পথ।

—চার ঘণ্টাই হোক আর চব্বিশ ঘণ্টাই হোক, এইটুকু আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে ডাক্তার ?

শুধু এই পথটুকু—কথা বলতে বলতে হীরালাল যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তুমি যত টাকা চাও তাই পাবে, তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে, আমায় বাঁচিয়ে রাখবে !

টাকার কথা আমি ভাবচি না হীরালালবাবু—ডাক্তার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েন। হীরালাল বলে, আর কিছু তা হলে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি শুধু আমার সঙ্গে চল। যেমন করে পার আমায় আর পাঁচটা ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখ। রায়বাহাদুরকে একটা কথা আমার না বললেই নয়।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই আপত্তি করে, এখনও ভাল করে রক্ত বন্ধ হয়নি, এই অবস্থায়—কিন্তু হীরালালকে থামান যায় না কিছুতেই। অবশেষে মীরা বলে, কিন্তু এ যে হয় না গো ! আমি কেমন করে মত দেব ?

হীরালাল আস্তে আস্তে মীরার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। তারপর বলে, আর আপত্তি করো না মীরা। আমি এখানেও মরব, কিন্তু মরেও শান্তি পাব না। আমায় এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দাও। যেমন করে পার জ্ঞান থাকতে থাকতে আমায় রায়-বাহাদুরের কাছে পৌঁছে দাও। যাও—ব্যবস্থা কর—আর সময় নেই—

মৃত্যু পথ যাত্রী স্বামীর এই অন্তিম অনুরোধের কাছে মীরাকে হার মানতে হয়।

শিশির ডাক্তার ডিস্পেন্সারীর চাকরী নিয়ে ভূষণায় আসবার পর থেকেই হীরালাল তাকে সুনজরে দেখতে পারেনি। এর কারণ আর কিছুই নয়, রায়বাহাদুরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হীরালাল লোকাল বোর্ডের টাকা কড়ি নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ছিনি মিনি খেলছিল, শিশির ভূষণায় পৌছবার পরেই তাতে পড়লো বাধা। সেটাও হীরালাল কোন রকমে সহ্য করে যাচ্ছিল, কিন্তু যখন শোনা গেল যে বেণীমাধব এই শিশির ডাক্তারকেই তার সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্টি করে গেছেন তখন হীরালালের পক্ষে চুপ করে থাকা কঠিন হল।

তারপর থেকে শিশিরকে বিপন্ন করাবার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু আজকের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর তার মনে হল, সমস্ত চেষ্টাই তার নিষ্ফল। মানুষের বিচার এড়িয়ে গেলেও বিধাতার বিচারকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তার নেই। সুতরাং নিজে যখন সে যেতে বসেছে তখন শুধু শুধু একটা নিরপরাধ লোককে দণ্ড ভোগ করিয়ে লাভ কি। তারচেয়ে রায়বাহাদুরকে সব কথা বলে যাওয়াই ভাল হয়ত তিনি কোন উপায় করতে পারবেন।

এই সব কথা ভেবেই সে কারও কোন কথায় কাণ দিলে না এবং তাকে সেই দিনই মোটরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল; ডাক্তার এবং গ্রামের আরও কয়েকজন গেলেন তার সঙ্গে।

হীরালালের মুখে সব কথা শুনে রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তিনি বিস্মিত, ক্ষুব্ধ কিম্বা ব্যথিত হয়েচেন একথা তাঁর মুখ দেখে অনুমান করা যায় না। ধীরে ধীরে উঠে তিনি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ধরেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর ওধারের সাড়া মেলে।

হ্যালো, কে আপনি, এটা বিনোদ সরকারের বাড়ী ত ? বিনোদ বিহারী সরকার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ? বাড়ী নেই ? কখন ফিরবেন জানেন না ? কিন্তু ভয়ানক জরুরী দরকার তাঁকে যেমন করে হোক যেখানে থেকে হোক খুঁজে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। যত তাড়াতাড়ি পারেন···হ্যাঁ রায়বাহাদুর চুণীলালবাবুর বাড়ীতে।

চুণীলাল হতাশ ভাবে সোফায় বসে পড়েন।

উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে হীরালাল জিজ্ঞাসা করে, পেলেন না খোঁজ পেলেন না বুঝি ?

না পেলাম না। রায়বাহাদুর মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আর যেন অন্তরের আবেগ চেপে রাখতে পারেন না—এই রকম সময় সব কথা যদি স্বীকার করতেই চাইলে তো আমার কাছে এলে কেন, হীরালাল আমার কাছে কেন এলে ? তুমি কি জানো না যে একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া আমার কাছে এসব কথা বলার কোন দামই নেই—আইন তা গ্রাহ্য করবে না।

তখন কিছুই ভেবে দেখিনি রায়বাহাদুর শুধু মনে হল এত বড় পাপ ঢেকে রেখে মরেও কোন শান্তি পাব না—তাই—তাই আপনার কাছে যেমন করে পারি ছুটে এসেচি। আপনি যাকে দরকার মনে করেন ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে সব দোষ স্বীকার না করে কিছুতেই মরবো না।

হীরালাল যেন প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে সজাগ থাকবার চেষ্টা করে।

টেলিফোনটা ঝনঝন করে উঠতেই রায়বাহাদুর উঠে পড়েন।

কে বিনোদ ? হ্যাঁ আমি চুণীলাল কোন কথা বলবার সময় নেই তুমি এখুনি এই মুহূর্ত্তে চলে এস—রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রায়বাহাদুর

ডাক্তারকে বলেন, আর মিনিট দশেক বাঁচিয়ে রাখুন, দশ মিনিট আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আপনি যা চান তাই দেব। শুধু বিনোদের কাছে ওর সব কথা যেন বলে যেতে পারে—"

ডাক্তার অবশ্য তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশান্ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ হীরালালকে সজাগ রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয় না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই হীরালালের প্রাণশূন্য দেহটা কৌচের উপর এলিয়ে পড়ে। সে দিকে চেয়ে ডাক্তার বলে ওঠেন, আর কিছুই করবার নেই।

রায়বাহাদুর কিন্তু এইখানেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সুমিত্রাকে খুঁজে বার করবার জন্যে তিনি একাধিক লোক নিযুক্ত করেন, এবং শিশিরকে কি করে খালাস করা যায় সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিতে থাকেন। কিন্তু আইনজ্ঞরা তাঁকে কোন রকম উৎসাহই দিতে পারেন না। রায়বাহাদুর শেষ পর্য্যন্ত একদিন অধৈর্য হয়ে বলেন, তা হলে আপনারা বলতে চান, কিছুই আমাদের করবার নেই? দিনকে আপনারা রাত করতে পারেন, আর একজন সত্যকার নিরপরাধ লোকের অন্যায় শাস্তি রদ্ করতে পারেন না? হীরালাল তার মৃত্যুশয্যায় যা স্বীকার করে গেল, আদালত তার কোন মর্য্যাদাই দেবে না? আপনারা তা হলে কি করতে আছেন?

রায়বাহাদুর যেন সমগ্র বিচার-ব্যবস্থার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। ব্যারিষ্টার একটু হেসে বলেন, আপনি আমাদের অকারণে দোষ দিচ্ছেন রায়বাহাদুর। এ কেসে আপীল করবার সমস্ত রাস্তাই যে বন্ধ হয়ে গেছে, একটু ভেবে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

হুঁ, বুঝেছি—রায়বাহাদুর চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে থাকেন, আর কোন কথা বলবার মত উৎসাহ যেন খুঁজে পান না।

সুমিত্রার সন্ধানের জন্য যে সব লোক নিয়োগ করা হয়েছিল তারাও কোন খোঁজ দিতে পারে না। এক একজন এক এক রকম খবর নিয়ে আসে, কিন্তু আসলে কোনখানেই শেষ পর্য্যন্ত তাদের সন্ধান মেলে না। রায়বাহাদুর বিরক্ত হয়ে বলেন, ও সব বাজে কথা অনেক শুনেছি। কোন্ রাস্তা থেকে কোন্ রাস্তায়. কোন্ বাড়ী থেকে কোন্ বাড়ীতে তারা গেছে, তার ইতিহাস আমি শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই আমার মেয়ে এখন কোথায় আছে কোন সন্ধান আপনারা পেয়েচেন কি না?

লোকগুলিকে সাতদিন সময় দিয়ে রায়বাহাদুর বলেন, এর মধ্যে যদি আপনারা আমার মেয়ের সন্ধান না আনতে পারেন তা হলে এখানে আর মুখ দেখাবেন না।

সাত দিনের বদলে সাত মাস কেটে যায়, ক্রমে ক্রমে সাতটি বছর, কিন্তু সুমিত্রার খোজ মেলে না।

অনেক দিন পরে দরিদ্র পল্লীর একটি ছোট ঘরে আবার যখন এই গল্পের যবনিকা উঠলো, তখন তারি মধ্যে ছোট্ট একটি মেয়েকে আমরা একরাশ পুতুল নিয়ে তন্ময় হয়ে খেলা করতে দেখলাম।

স্কুলের বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েটির যেন সেদিকে খেয়ালই নেই। ঝি এসে বলে, মিনু গাড়ী এসেছে, স্কুলে চলো।

মিনু বলে, আমি তো যাবো না। হরিদাদা কোথায়? আজকে যে আমার নতুন শাড়ী আনবে বলেছিল, আনেনি কেন!

অভিমানে মিনুর চোখ দুটি ছল ছল করে। ঝি বলে, জানি না বাপু। হরিদা তোমার মার ঘরে, জিজ্ঞাসা করে দেখ।

মিনু বই-শ্লেট কোন রকমে গুছিয়ে দিয়ে ছোটে মায়ের ঘরের দিকে।

সুমিত্রা তখন সেলাইয়ের কল নিয়ে সেলাই করতে ব্যস্ত। হরিহর কতকগুলো জামা পুটুলীতে বাঁধতে বাঁধতে বলছিলেন, আজ তা হলে নিয়ে যাচ্চি চারটে ব্লাউজ, দুটো সেমিজ আর দুটো ফ্রক্। আর কিছু নেই তো ?

আর পেরে উঠলাম না হরিকাকা। কালরাত একটা পর্য্যন্ত জেগেও হয়ে উঠলো না—সুমিত্রা বলে।

—রাত একটা পর্য্যন্ত জেগেছ, বেশ করেছ! একটার বদলে সারা রাত জাগলেই তো পারতে! হরিহরের কণ্ঠে বিরক্তি না বেদনা কিছুই বোঝা যায় না, তিনি বলতে থাকেন, তারপর একদিন অসুখ করে বিছানায় পড়ে থাক, তা হলেই সংসারের সব দুঃখ ঘুচে যায়!

সুমিত্রা কোন জবাব দেবার আগেই মিনু এসে বলে, হরিদা, আমার নতুন শাড়ী কই ? আনোনি ?

ওই যাঃ! ভুলে গেছি—হরিহর যেন মস্ত বড় অপরাধ করে ফেলেছেন, এমনি ভাবে মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

—হ্যাঁ, ভুলে গেছ! রোজ রোজ তুমি ভুলে যাও! মিনু এবার শ্লেট আর বইগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, বেশ, তাহলে আমিও স্কুলে যাব না।

সুমিত্রা বলে, সে কি মিনু! গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে যে!

—হ্যাঁ, এই একটা ফ্রক্ পরে রোজ রোজ স্কুলে যাই, সবাই কি রকম ঠাট্টা করে জান। মিনুর চোখে জল এসে পড়ে।

সুমিত্রা বলে, তা করলেই বা ঠাট্টা। সবাই তো রোজ রোজ শাড়ী বদলাবার মত বড়লোক নয়।

কিন্তু এসব কথা মিনুকে বোঝান বৃথা। তাই হরিহর তাড়াতাড়ি বলেন, আচ্ছা দিদি কালই তোমার নতুন শাড়ী এনে দেব।

বৃষ্টির পর রোদের মত মিনুর মুখখানি হাসিতে ছেয়ে যায়।

—ঠিক আনবে তো তা'হলে?

হরিহর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বাইরে থেকে স্কুলের বাসের হর্ণ শোনা যায়। শ্লেট আর বইগুলো তুলে নিয়ে মিনু এবার ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায়।

সুমিত্রা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর বলে, এসব আবদারের কেন প্রশ্রয় দাও, হরিকাকা। কাল কোথা থেকে শাড়ী এনে দেবে শুনি?

হবে, হবে, একটা শাড়ী বইত নয়—হরিহর যেন সুমিত্রাকে স্তোকবাক্যে ভুলোবার চেষ্টা করেন।

সুমিত্রা বলে, একটা শাড়ী কেউ তোমায় অমনি দেবে না। কি করে সংসার চলবে তা'ত সবই জান। মিনুর স্কুলের মাইনেটা জোগাড় করতেই প্রাণান্ত, তার ওপর আবার এই সব বাজে খরচ কি জন্যে?

হরিহর ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, তুমি মিছিমিছি টিক্‌টিক্ কোরো না মা, বাজে খরচ! শিশির ডাক্তারের মেয়ে একটার বেশী দুটো শাড়ী পরলেই যেন বাজে খরচ হয়, সংসারে যেন আর বাজে খরচ হচ্ছে না...

আরও কতকগুলো কথা যেন নিজের মনেই বলতে বলতে তিনি পুঁটলীটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

যেতে যেতে রাগটা পড়ে ঝি'র উপর। রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তেই হরিহর বলে ওঠেন, বলি তোমার আক্কেলটা কি বলত, সুখোর মা। রান্নাবান্না হয়ে গেল, এখনও উনুনে গন্‌গন্‌ করচে আঁচ। কয়লা কি মিনি মাগনা আসে যে যত পার উনানে ঠেসেছ!

ঠেসেছি ত হয়েছে কি! সুখোর মার ঝঙ্কার রান্নাঘরের ভেতর থেকেই শোনা যায়।

—হয়েছে কি! সংসার কি করে চলচে তা খেয়াল আছে, যা খুশী বাজে খরচ করলেই হ'ল! উনানে জল ঢেলে আঁচটা নিভিয়ে দিলেও ত পার!

হ্যাঁ, নিভিয়ে দিতেও পারি, কথা বলতে বলতে সুখোর মা দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়, তারপর কাপড়-চোপড়গুলো সেদ্ধ হ'বে কিসে—কার চুলোতে?

ওঃ, কাপড় সেদ্ধ হ'বে বুঝি—হরিহর এবার একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। সুখোর মা আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, সেদ্ধ হ'বে না ত কি রোজ রোজ সাজো কাচিয়ে গণ্ডা গণ্ডা পয়সা গুণতে হবে! আমার গতরে তো আর ঘুণ ধরেনি।

—আহা রাগ করিস কেন, আমি কি সেকথা বলেছি—

হরিহর আর সেখানে দাঁড়ান যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

এই ক'বছরে হরিহর সুমিত্রাকে সত্যি আপনার করে নিয়েচেন। মিনু যেদিন সুমিত্রার কোলে এল সেদিন সুমিত্রার দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার আর অন্ত ছিল না, কেবলই মনে হ'ত নিজের অদৃষ্টে যা ঘটবার তাতো ঘটেইচে, কিন্তু পেটে যেটা এসেচে তাকে কি করে মানুষ করে তুলবে। কিন্তু হরিহর একা একশো হয়ে তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা মুছে দিয়েছিলেন। বৃষ্টির রাত্রিতে যেদিন সুমিত্রার প্রথম ব্যথা ওঠে সেদিন

এই হরিহরই তাকে স্নেহময়ী মার মত সাহস আর সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই সমস্তই ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে মিনুকে কোলে নিয়ে সে যখন ফিরে এলো তখনও এই হরিহর এবং সঙ্গে সঙ্গে সুখোর মা স্নেহ যত্ন আর সেবা দিয়ে তাকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ করে তুলেছিল। তাই আজও মাঝে মাঝে সুমিত্রা মনে মনে ভাবে, এই দুটি লোককে সে যদি না পেত, তা'হলে এই দুঃসহ দুঃখের দিনগুলি কাটতো কি করে? কোন মতেই বোধহয় কাটতো না এবং সুমিত্রাকে হয়তো পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে অথবা আত্মহত্যা করতে হ'ত। কিন্তু ভগবানের পৃথিবীতে মানুষ যেমন অন্যায় করে, অবিচার করে, তেমনি নিঃসম্পর্ক মানুষ কেমন অনায়াসে পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে, দুঃখের জীবনে নিয়ে আসে স্নেহ আর সান্ত্বনার আশীর্ব্বাদ। তা নইলে রসাতলের সঙ্গে পৃথিবীর চেহারার বিশেষ কোন তফাৎ বোধহয় থাকতো না।

জেলখানায় শিশিরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে, সংসারের সমস্ত ছোটবড় কাজের বোঝা হরিহর বেশ হাসিমুখে বয়ে বেড়াচ্ছেন, কি করে সংসারের খরচ কমান যায়, আবার ঠিক কি রকম ব্যবস্থা করলে মিনু আর সুমিত্রার কোন রকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু দুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা বেশ একটু কষ্টকর, তাই মাঝে মাঝে যেন তিনি কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না; আর সেই সময় তাঁর কথা আর কাজের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া হয় কঠিন। সুমিত্রা কিন্তু মনে মনে সবই বোঝে এবং বোঝে বলেই এই নিঃসম্পর্ক পরমাত্মীয়টির প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

সেদিন মিনু বই শ্লেট নিয়ে বিমর্ষভাবে ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ

রেণু এসে পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করে, তুই খেলতে যাসনি, মিনু? আমি তোকে কত খুঁজে বেড়াচ্ছি!

মিনু জবাব দেয়, না ভাই, ওরা ত আমায় ডাকে না। আমি সেদিন পিক্‌নিকে যাবার চাঁদা দিতে পারিনি, তাই কত টিট্‌কিরি দিলে বেলা।

সমস্ত ক্লাসের মধ্যে এই রেণুর সঙ্গেই মিনুর হৃদ্যতা একটু বেশী। সেই বলে, সত্যি ভাই বেলাটার ভারি দেমাক। আজ একটা নতুন মোটর চড়ে স্কুলে এসেচে বলে কি চালটাই করচে। মোটর যেন আমরা কখন চড়িনি।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলা এসে দাঁড়ায় সেইখানে। যেন কিছুই জানে না এমনি একটা ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কার মোটর চড়েছিস রে? মিনুদের নাকি? ক'খানা মোটর আছে মিনুদের?

ঠাট্টাটা সোজা মিনুর বুকে গিয়ে বেঁধে। কিন্তু এই দাম্ভিক মেয়েটার কাছে হেরে যেতে সে নারাজ। তাই বেশ জোর গলাতেই জবাব দেয়, আছেই তো মোটর। আমার দাদুর তোমাদের চেয়ে ঢের বড় মোটর আছে, জানো। আমরা সে কথা কাউকে বলে বেড়াই না, তাই।

—তাই নাকি! বলতে লজ্জা করে বোধহয়—অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বেলা হাসতে সুরু করে, তোর দাদু ট্যাক্সি চালায় বুঝি?

ইতিমধ্যে আরও দু' চারিটি মেয়ে এসে জড় হয়েছিল সেইখানে, তারাও বেলার সঙ্গে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

মিনু কিন্তু হটিবার পাত্র নয়, ঘাড় ঘুরিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলে, ট্যাক্সি চালাবে কেন? আমার দাদু মস্ত বড় লোক। তার কত বড় বাড়ী, কত টাকা...

বেলা তার বই রাখবার সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, সে ত নাতনীকে দেখেই বুঝতে পারচি...

অন্য মেয়েগুলি আর এক দফা হো হো করে হেসে উঠে।

ক্লাসের মধ্যে না ঢুকে বেলা আবার বেরিয়ে আসে। মিন্থুর কাছে এসে বিদ্রূপতীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, একদিন তোদের মোটরটা দেখলে হ'ত না?

আচ্ছা আমি দেখাব, নিশ্চয়ই দেখাব—মিন্থু জোর গলাতেই জানায়।

বেলাদের দল আবার তেমনি করে হাসতে সুরু করে! মিন্থু যে কি করে এদের সায়েস্তা করবে, বুঝে উঠতে পারেনা। ঘণ্টা বেজে উঠতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সকলের পিছনে ক্লাসে গিয়ে ঢোকে।

ইংরিজী টীচার রাণীদি সকলের হাতের লেখার খাতাগুলো পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ তার চশমা সমেত মুখটা তুলে তাকান। তারপর খাতাগুলোর মধ্যে থেকে অর্দ্ধছিন্ন একটা খাতা তুলে নিয়ে হাঁক পাড়েন, এ খাতা কার?

তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, খাতাখানা হাতে করে ধরতেও তাঁর রীতিমত ঘৃণা হচ্ছে।

মিন্থু ভয়ে ভয়ে তার সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে রাণীদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রাণীদি বলেন, ও, তোমার বুঝি! তা খাতার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। এর বদলে গোটাকতক শালপাতার ঠোঙা আনলেই তো পারতে, লেখাও হ'ত, মুড়ি মুড়কি খাওয়াও চলতো!

মেয়েদের মধ্যে অনেকে মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে সুরু করে। রাণীদি এবার মিন্থুর দিকে চেয়ে ধমকে ওঠেন, তোমায় কতদিন বলেচি, এ খাতায় চলবে না, ভাল বাঁধান, খাতা আনতে।

অপমানের আঘাতটা মিনু মনে মনে বিশেষ করেই অনুভব করে; চোখে জল আসবার উপক্রম হলেও সে কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করে জবাব দেয়, মা বলেচেন, এটা ফুরুলে কিনে দেবেন।

ফুরুলে কিনে দেবেন! রাণীদি খাতাখানা টেবলের উপর থেকে সশব্দে নিচে ছুঁড়ে ফেলেন, তারপর মিনুর দিকে চেয়ে তাঁর স্বাভাবিক কাংস্য বিনিন্দিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, মাকে বলে দিও, ধানদুব্বো দিয়ে লেখাপড়া হয় না, তা'তে পয়সা লাগে; বুঝেছ! খবরদার এ-খাতা যেন আর আমার টেবিলে না দেখি।

ক্ষোভে, দুঃখে মিনু চোখের জল আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না। কোন রকমে এগিয়ে গিয়ে খাতাখানা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আসে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তার দিকে চেয়ে হাসতে আরম্ভ করে; আর তাদের মধ্যে একজনের হাসির ঝঙ্কারটা রীতিমত প্রবল হয়ে ওঠে।

হেসো না, হেসো না, রাণীদি ক্লাসে ডিসিপ্লিন রাখবার চেষ্টা করেন, কে হাসচে কে? বেলা তার সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আদুরে গলায় বলে, আমি দিদিমণি—

ও, তুমি—রাণীদির গলার স্বর আশ্চর্য্য রকম বদলে যায়,—বেলা বড়লোকের মেয়ে—দিদিমণির কাছে তাই তার একটু আলাদা খাতির। রাণীদি গলাটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলেন, কি হয়েচে বেলা?

বেলা বলে, কিছু হয়নি দিদিমণি, তবে ভাবচি, আপনি মিনুর খাতা ফেলে দিলেন, ওর দাদু জানলে রাগ করবেন।

দাদু রাগ করবেন? রাণীদি একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিজ্ঞাসা করেন।

ও, আপনি জানেন না বুঝি—বেলা মিনুর দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে বলতে থাকে, মিনুর দাদু যে মস্ত বড়লোক্, আমাদের স্কুলের তিন তিনটে বাড়ীর মত তাঁর বাড়ী আর দশ-পনেরটা মোটর আর ঘরে ঘরে দুটো করে দরোয়ান—মিনুই বলছিল দিদিমণি—

মিনু উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে চায়, বলতে চায় যে ঠিক এই ধরণের কথা সে কোনদিনই বলেনি, কিন্তু রাগে আর দুঃখে হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে যেন অশ্রুর বন্যা নেমে আসে, কোন কথাই তার বলা হয় না।

মিনুর অসহায় অবস্থা দেকে রেণু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মিনু একথা বলেনি। কিন্তু বেলার রিপোর্টের পর আর কারও কথা বলাই বোকামী, তাই রেণুর দিকে চেয়ে রাণীদি ধমকে ওঠেন, চুপ করো তুমি—

তারপর মিনুর দিকে চেয়ে তিনি ঠাট্টার সুরে বলেন, তাই নাকি মিনু, তোমার দাদু এত বড়লোক, গড়ের মাঠের জমিদার বোধহয়। দমকলের মত গাড়ী আর হাইকোর্টের গোটা বাড়ীটাই তাঁর, কি বলো?

মেয়েগুলি এবার একসঙ্গে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

রাণীদি আরও যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, তা তোমার দাদুর নামটা কি, বলো ত? এতবড় একজন লোকের নামটা আমাদের জেনে রাখা ভাল।

মিনু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কোন রকমে কান্না চাপবার চেষ্টা করে। তার সেই অসহায় অবস্থার দিকে চেয়ে ক্লাসের ছোট ছোট মেয়েগুলির সঙ্গে রাণীদিও যেন সমান কৌতুক অনুভব করেন।

কই দাদুর নামটা বলো—তিনি আবার প্রশ্ন করেন।

মিনু আর কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারেনা। চোখের জলে সমস্ত ক্লাস-রুমটাই যেন তার সামনে ঝাপসা হয়ে আসে।

সমস্তদিন শুধু দাদুর কথাই মিন্থর মনের মধ্যে তোলপাড় করে। হরিদা'র কাছে দাদুর কত গল্পই সে শুনেচে, তাঁর ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি ...সব কথাই হরিদা তাকে বলেচে, বলেনি শুধু দাদুর নামটা। কেন বলেনি কে জানে! কিন্তু দাদুর নামটা আজ তাকে জেনে নিতেই হবে, নইলে বেলার দলকে ঠাণ্ডা করা যাবেনা কিছুতেই। তারপর দাদুর নাম যখন ওরা শুনবে, তখন তাদের মুখের ভাব এক মিনিটের মধ্যেই কিরকম বদলে যাবে, সেই কল্পনায় মিন্থ যেন এতবড় দুঃখের মধ্যেও অনেকখানি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু হরিদা কি বলবেন? দাদুর নাম জিজ্ঞাসা করলেই মা এমনি রেগে ওঠেন যে, হরিদা আর কোন কথা বলবার সাহস পাননা। কিন্তু হরিদা'র আর চুপ করে থাকলে চলবেনা। সবকথা তাকে বলতেই হবে।

মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে মিন্থ বাড়ী ফিরে আসে।

সন্ধ্যার পর হরিহরের সঙ্গে দেখা হতেই সে দাদুর নাম জানবার জন্য পীড়াপীড়ি স্থরু করে দেয়।

—না, আমি কোনকথা শুনবোনা, তোমায় বলতেই হবে।

হরিহর কাছে বসে মাথা নাড়েন, কোন জবাব দেননা।

—তাহলে কেন তুমি বলেছিলে আমার দাদু আছে, কেন বলেছিলে দাদু মস্ত বড়লোক? মিন্থ রীতিমত নালিশের স্থরে হরিহরকে প্রশ্ন করে।

হরিহর বলেন, অন্যায় করেছিলাম দিদি, অন্যায় করেছিলাম। লক্ষ্মী দিদি, তুমি এখন ঘুমোও।

দিদির কিন্তু ঘুমোবার কোন লক্ষণই দেখা যায়না।

তুমি তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলে? তোমার জন্তেই ইস্কুলে আমায় আজ এত অপমান হতে হ'ল। মিন্থর চোখে জল আসবার উপক্রম!

হরিহর বিব্রত হয়ে বলেন, মিথ্যে ঠিক আমি বলিনি দিদি....

তাহলে কেন তুমি নাম বলচো না? না, দাদুর নাম তোমায় বলতেই হবে, নইলে আমি ছাড়বো না। না, কিছুতেই না—মিনু এবার হরিহরের হাত ধরে টানতে সুরু করে, বলে, আজ আর তুমি যাত্রার আখড়ায় যেতে পাবে না।

হরিহর রোজ রাত্রে এই সময় যাত্রার আখড়ায় যান। একদিন নড়চড় হয় না! মিনুর জেরার মুখে পড়ে সে কথা যেন তিনি ভুলে যেতে বসেছিলেন। এখন সে কথা স্মরণ হ'তেই হরিহর ব্যস্ত হয়ে পড়েন, ছাড় দিদি ছাড়, আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

মিনু কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে চায় না তাঁকে। হরিহর যেন বিরক্ত হয়ে ওঠেন,—সেনাম শুনে তোর লাভ কি দিদি! নামেই সে শুধু তোর দাদু, আসলে সে তোদের শত্তুর!

মিনুকে তবু শান্ত করা যায় না। সে বলে, তা হোক, নাম তোমায় বলতেই হবে।

—তাঁর নাম রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরী, নাও এখন হ'ল তো—হরিহর এক রকম জোর ক'রেই মিনুর হাতটা নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, নামটা মুখে আনতেও আমার ঘেন্না হয়। মানুষ তো নয়, শুধু পাষাণ। তোর দাদুর যদি মানুষের প্রাণ থাকতো, তাহলে তোদের কি আজ এই দুর্দ্দশা হয়!

মিনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনেই যেন কত কি ভাবে। তারপর বলে, দাদু খুব খারাপ লোক বলে আমরা তার কাছে যাই না, না হরিদা? একবার দেখতে পেলে দাদুকে আমি এমনি বকে দিতাম!

আচ্ছা, তাই বকে দিও, এখন চুপ করে ঘুমোও দেখি। হরিহরের মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে ওঠে। একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেন, মাকে কিন্তু এসব কথা কিছু বলো না কখন।

মিনু জবাব দেবার আগেই সুমিত্রা ঢোকে ঘরের মধ্যে। হরিহর আর মিনুর দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, দাদু নাতনীতে লুকিয়ে লুকিয়ে কি সলা পরামর্শ হচ্ছে? কাকে বকুনী দেওয়া হবে?

—কিছু না, কিছু না। হরিহর রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েন। যত সব ছেলেমানুষী কথা! আচ্ছা, আমি এখন আসি।

আনলা থেকে ভাজ-করা ছেড়া চাদরটা তুলে নিয়ে হরিহর বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেন। সুমিত্রা বলে, যাত্রার আখড়ায় চললে তো?

হরিহরকে ফিরে দাঁড়াতে হয়, বলেন, কি করি বল রাত হ'লেই মনটা কেমন উসখুস করে। অনেক দিনের নেশা।

তাত বুঝলাম, সুমিত্রা একটু রাগ করেই বলে, কিন্তু নিজের শরীরটাও তো দেখতে হবে। সারাদিন ডাক্তারখানায় চাকরী করবে, বাড়ীর খাটুনী খাটবে, তার ওপর রোজ রোজ রাত জেগে এই যাত্রার সং সাজতে না গেলেই নয়! এমন করে শরীর ক'দিন টিকবে। না, এ পোড়া নেশা তোমায় ছাড়তেই হবে।

বাঃ বেশ কথা! হরিহর রীতিমত রেগে ওঠেন, আমার যেন সাধ আহ্লাদ সখ বলে কিছু নেই! সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে একটু যাত্রা করতে যাব, তাতেও তোমাদের মানা! কতদিন তোমায় বলেছি, রাত্রে একটু আখড়ায় গিয়ে মহলা না দিলে আমার ঘুম হয় না। আমায় তুমি বারণ করো না মা, বলে দিচ্ছি।

হরিহর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যান, আর তাঁর এই রাগ

আর ব্যস্ততা দেখে স্থমিত্রার মুখে ফুটে ওঠে মধুর হাসি। সত্যি, এই অনাত্মীয় লোকটির সাহায্য আর আশ্রয় না পেলে আজ যে কি করে তাকে দিন কাটাতে হ'ত, সেকথা ভাবতেও তার ভয় হয়! মিনি যখন প্রথম কোলে এল, সেই দিন থেকে এই হরিহর তাকে কোলে পীঠে মানুষ করে সাধ্যমত কোন অভাবই তাকে বুঝতে দেন নি! নিজের বলতে তাঁর কিছুই নেই, তাই গ্রামের ডিস্‌পেন্সারীর এতকালের চাকরীটা ছেড়ে দিতেও তাঁর বিন্দুমাত্র দেরী হয় নি। স্থমিত্রাকে নিয়ে কলকাতাতেই থেকে গেছেন এবং সেখানকার এক ডাক্তারখানায় চাকরীও একটা জোগাড় করে নিয়েচেন। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তুলনায় এখানকার ডাক্তারখানায় খাটুনি তাঁর বেশী, কিন্তু সে খাটুনীতে তাঁর ক্লান্তি নেই, এতটুকু বিরক্তিও না। আত্মভোলা এই মানুষটির কৃতজ্ঞতার ঋণ যে কি করে শোধ করা সম্ভব হবে, স্থমিত্রা যেন ঘুমন্ত মিনুর মুখের দিকে চেয়ে শুধু সেই কথাই ভাবে।

আসল কথাটা জানা থাকলে স্থমিত্রার ঋণের বোঝা বোধ হয় আরও ভারি হয়ে উঠতো। কারণ যাত্রায় আখড়ার নাম করে হরিহর প্রতি রাত্রে যেখানে যেতেন, সেটা আর একটা ডাক্তারখানা। দিনের চাকরীর আয়ে কুলোয় না বলে রাত্রের এই উপরী আয়ের ব্যবস্থা তাঁকে গোপনে করতে হয়েছে। স্থমিত্রার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে একটু সময় নষ্ট হয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি সেইখানেই পৌছুলেন।

হরিহরকে ঢুকতে দেখে একজন কর্ম্মচারী ডাক্তারখানার মালিকের দিকে চেয়ে বলে ওঠে, দেখচেন স্যার, এতক্ষণে নবাব সাহেবের আসবার সময় হ'ল।

একটু দেরী হয়ে গেল—হরিহর সসঙ্কোচে কর্ত্তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কর্ত্তা গম্ভীরমুখে বল্লেন, একটু নয় হরিহর একঘণ্টা দেরী আর আজ প্রথম নয়, এরকম তো প্রায়ই হ'চ্চে। তাছাড়া রাত্রের কাজ—আমায় পর্য্যন্ত তোমার জন্ম বসে থাকতে হ'চ্চে।

যে কম্পাউণ্ডারটির ডিউটি শেষ হয়েছিল সে ফোড়ন দেয়, ওঁর ত এটা চাকরী নয় স্যার, উনি আসেন গায়ে ফুঁ দিয়ে আড্ডা দিতে আমরাই শুধু খেটে মরি।

কর্ত্তা বল্লেন, রাত্রে যদি অসুবিধা হয়, তোমায় না হয় দিনেই বদলি করে দিচ্চি, আর সত্যি, বয়স তো কম হ'ল না, এবয়সে রোজ রোজ রাত জাগবেই বা কি করে?

না, না, দিনে আমি পারবো না স্যার, হরিহর সজোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানান। আমায় মাফ করবেন, কাল থেকে আমি বরং ঠিক সময়েই আসবো।

কর্ত্তা একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার বলতো? সাধ করে তুমি রাত জাগতে চাও, দিনে কি এমন তোমার অসুবিধে?

আজ্ঞে আজ্ঞে সংসারের কাজ....হরিহর যেন রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

সংসার? তোমার সংসার খুব বড় নাকি হরিহর? ছেলেপুলে কতগুলি?

ছেলেপুলে! এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে হরিহর জবাব দেন আজ্ঞে ছেলেপুলে ত নেই।

কর্ত্তার বিস্ময়ের মাত্রা যেন বেড়েই যায়। তিনি আবার প্রশ্ন

করেন, ছেলেপুলে নেই, তবু বলছ সংসারের ঝঞ্ঝাট, কে কে আছে তাহলে সংসারে?

আজ্ঞে, আছে একটি নাতনী—হরিহর জবাব দেন।

একটিমাত্র নাতনী! কর্ত্তা এবার হেসে ফেলেন।

হরিহর বলে, হাসবেন না স্যার, হাসবেন না। একটি হ'লে কি হয়, একাই একশ। মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হরিহর আবার বলেন, একটা নিবেদন ছিল, স্যার। যদি কিছু আগাম দিতেন তাহলে কাল বাসায় ফেরবার সময় একখানা শাড়ী কিনে নিয়ে যেতাম। ক'দিন থেকে বড্ড বায়না ধরেচে।

কর্ত্তা ড্রয়ারটা টানতে টানতে বলেন, মাসের মাইনেটা প্রায় আগাম নিয়েই শেষ ক'রেছ, তা খেয়াল আছে?

হরিহর উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে মাথা চুলকান। কর্ত্তা ড্রয়ার থেকে দশ টাকার একখানা নোট বার করে হরিহরের হাতে দেন।

হরিহর নোটখানা ফতুয়ার পকেটে পুরে কাজ করবার জন্যে এগোয়। কর্ত্তা হরিহরের দিকে চেয়ে কতকটা নিজের মনেই বলেন, তোমার মত কম্পাউণ্ডার পুষতে গিয়ে আমার ব্যবসাই না মাটী হয়!

শাড়ীখানা অবশ্য হরিহরের মারফতে মিনুর কাছে এসে পৌঁছিল গোপনে। সুমিত্রা তখন রান্নাঘরে, কাজেই কোন অসুবিধা হরিহরের হয়নি। শাড়ী দেখে মিনুর মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো। ঠিক করলে শাড়ীখানা পরে একেবারে রান্নাঘরে হাজির হয়ে মাকে অবাক

করে দেবে। তারপর সুরু হোল মনোমত করে শাড়ীখানি পরবার দুঃসাধ্য চেষ্টা। এমন করে সেখানা পরতে হবে, যাতে বেলা থেকে আরম্ভ করে তার দলের সবাই একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কিন্তু এতদিন যার ফ্রক্ পরে কেটেছে, নিজের চেষ্টায় শাড়ী পরা তার পক্ষে একটু শক্ত। তাই কাজটা সুসম্পূর্ণ হবার আগেই সুমিত্রা এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মেয়ের শাড়ী পরার ধরণটা লক্ষ্য করে, কোন কথাই বলে না।

মিনু মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, কিরকম হয়েচে বল না মা? ভালো হয়নি শাড়ীটা?

হ্যাঁ, ভাল হয়েচে। হরিকাকা এনে দিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, মা। তোমায় বলতে হরিদা বারণ করেছিল। লক্ষ্মী মামণি, তুমি হরিকাকাকে বকতে পারবে না। বলো বকবে না।

সুমিত্রা একটু হেসে জবাব দেয়, না, মা, বকবো কেন! কিন্তু তোমার হরিদার বুদ্ধিশুদ্ধি আর কখনও হবে না।

মিনু বলে, তা না হোক গে। হরিদা খুব ভাল। আমি তা হলে এইটা পরেই স্কুলে যাচ্ছি মা। তুমি কিন্তু হরিদাকে বকো না যেন!

না রে, না—সুমিত্রা হাসি মুখে মিনুকে আশ্বস্ত করে।

মিনু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়।

বাইরে থেকে যেন ডাক পাড়ে, হরিবাবু বাড়ী আছেন নাকি?

কণ্ঠস্বর অচেনা। সুমিত্রা সুখোর মাকে বলে, দেখতো কে হরিকাকাকে খুঁজছে। সুখোর মা কি একটা কাজ করছিল, উঠে

গিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করে লোকটা কে তাই দেখবার চেষ্টা করে। লোকটিকে যেন চিনতে পারে না। ভিতর থেকেই জিজ্ঞাসা করে, কাকে চাই ?

হরিবাবু আছেন ? লোকটি বলে, আমি জামার দোকান থেকে আসচি, তাঁর জামার মজুরী নিয়ে।

সুমিত্রা বলে, ওকে ভিতরে আসতে বল্ সুখোর মা।

সুখোর মা দরজা খুলে দিতে লোকটি ভিতরের উঠানে এসে দাঁড়ায়।

—পেন্নাম হই মা, কাল রাত্তিরে হরিবাবুর ডাক্তারখানায় যেতে পারিনি কিনা, তাই ভাবলাম. সকাল বেলায় বাড়ীতেই দামটা দিয়ে যাই। হরিবাবুর যে কড়া তাগাদা!

সুখোর মা বলে, তা ডাক্তারখানায় হরিবাবুকে রাত্তিরে পাবে কি করে ? তিনি তো রাতে সেখানে কাজ করেন না।

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলে, আজ্ঞে করেন বইকি। সেইখানেই তো তাঁকে পেরায়-দিন দাম চুকিয়ে দিয়ে আসি। সেখান থেকেই আজ এ বাড়ীর ঠিকানা জেনে এলাম।

লোকটি জামার পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বা'র করে সুমিত্রার হাতে দিতে দিতে বলে, এই নিন মা চারটে ফ্রক, চারটে ব্লাউজ আর আটটা সেমিজের দাম।

সুমিত্রা টাকা ক'টা হাতে নিয়ে গুনে দেখে। তারপর মনে মনে একটা হিসাব করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই শুধু ? হরিকাকা যে অনেক বেশী নিয়ে আসেন।

লোকটি একটু আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দেয়, আজ্ঞে, তা কি করে হয়। দাম তো আমি ঠিক—তার কথা শেষ হবার আগেই দেখা যায় হরিহর আসচেন। লোকটি তাঁকে দেখে আবার সুরু করে ওই তো উনি

এসেচেন, ওকেই শুধিয়ে দেখুন না···কত ক'রে আমরা মজুরী দিই—

লোকটিকে উঠানের মাঝখানে সুমিত্রার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই যেন হরিহরের হাড়-পিত্তি জলে গিয়েছিল। লোকটির সামনে পৌছেই তিনি প্রায় দাঁত মুখ খিচিয়ে বলে ওঠেন, তার আগে এখানে তুমি কি করতে এসেচ শুনি—এখানে তোমার আসার কি দরকার ছিল?

এখানে আসায় এমন কি অপরাধ হ'তে পারে লোকটি যেন ভেবে পায় না, জিজ্ঞাসা করে, আপনি হঠাৎ রাগান্বিত হলেন কেন?

রাগান্বিত হব না—হরিহর আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, এখানে আসতে তোমায় কে বলেছে শুনি? লোকটি বিব্রত হয়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, দেখুন দেখি মা, আমার অপরাধটা কি! কোথায় বাড়ী বয়ে টাকা দিতে এলাম, আর উনি কিনা আমায় ধমকাচ্চেন!

সুমিত্রা বলে, সত্যি ওর কি দোষ হরিকাকা—

না, না, এসব আমি পছন্দ করি না। হরিহর রীতিমত বিরক্তভাবে বলেন, তুমি এখন এখান থেকে সরে পড় বাবু—

বেশ তাই যাচ্চি। কিন্তু আমার অপরাধটা কি তাইতো আমি বুঝতে পারলুম না। কাল রাতে আপনার ডাক্তারখানায় যেতে পারিনি বলে—

হরিহর আরো অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, লোকটার মুখের কাছে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে বলেন, আচ্ছা আচ্ছা হয়েচে, তুমি এখন বিদায় হও দেখি।

লোকটি কিছুই বুঝতে না পেরে একবার সুমিত্রা এবং আর একবার হরিহরের মুখের দিকে চাইতে চাইতে বেরিয়ে যায়।

হরিহর উঠোনের মাঝখানেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন ভয়ানক একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে তাঁর। এমনিভাবে কতক্ষণ কাটবার পর হঠাৎ তিনি সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে ওঠেন, এখন আর চুপ করে আছ কেন? যা বলবার বল? সবই তো জেনে ফেলেছ।

—জেনেই তো চুপ করে আছি, হরিকাকা। সারাদিন খাটুনীর পর রোজ রাত্রে তুমি যাত্রার নাম ক'রে কাজ ক'রতে যাও। আমার যা পাওনা তার ডবল মজুরী তুমি এনে দাও, এর পর আর কি আমার বলবার থাকতে পারে!

শেষের দিকটায় সুমিত্রার কণ্ঠ যেন ভারি হয়ে আসে।

হরিহর বলে ওঠেন, তা আমি আর কি করব বল! চোখের ওপর সংসারটা তো আর ভেসে যেতে দিতে পারি না। এমনি দিলে তো নেবে না। পাছে তোমার মনে লাগে তাই না হয় দুটো মিছে কথা ব'লেছি। তাতে যা দোষ হয়েছে তার সাজা দাও। তা হলেই তো হ'ল।

কথাগুলো বলেন তিনি সুমিত্রাকে, কিন্তু সমর্থন খোঁজেন সুখোর মার দিকে চেয়ে।

সুমিত্রা একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার মত লোকের সাজা যে আমার জানা নেই, হরিকাকা!

বাঃ, এত মহা ফ্যাসাদ দেখছি! হরিহর এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে আবার বলেন, বেশ; তোমার সংসারে এ পর্য্যন্ত কত কি দিয়েছি তার হিসেব করে না হয় একটা খৎ লিখে দাও। কড়ায় গণ্ডায় একদিন সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেব। তা'হলে তো হবে!

হরিহরের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় তিনি একটা মস্ত বড় সমস্যার

অতি সহজ সমাধান করে ফেলেচেন। কিন্তু সুমিত্রা ব্যাপারটা যেন ঠিক সে ভাবে নিতে পারে না। তাই খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমাদের ঋণ যদি এত সহজে শোধ করা যেত!

চোখে জল এসে পড়ায় সুমিত্রা আর সেখানে দাঁড়ায় না, তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে যায়।

হরিহর সঙ্গে সঙ্গে সুখোর মার দিকে চেয়ে বলতে সুরু করেন, দেখলে সুখোর মা! দেখলে তো বিচারখানা! সাজা চাইচি, তাতেও সন্তুষ্ট নয়! এখন আমি কি করি বল ত?

হরিহর যেন আবার মহাসমস্যার মধ্যে পড়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে যান।

সুখোর-মা খানিক তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দেয়, তুমি একটি আস্ত আহাম্মুক। গলায় কলসী বেঁধে তোমার ডুবে মরাই উচিত...

তাই মরতাম সুখোর মা, তাই মরতাম! হরিহর সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সংসারে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। নেহাৎ ওই মিনু-দিদি...কথাটা শেষ না করেই হরিহর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান। সুখোর-মা তার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু হঠাৎ মনে হয় তার চোখেও বুঝি জল এসে পড়বে!

স্কুলের লনের দোলনায় মিনু দোল খাচ্ছিল, রেণু দাঁড়িয়েছিল তার নিকটেই, হঠাৎ বেলা সেখানে সদলে হাজির।

দোলনাটা হাত দিয়ে টেনে ধরে বলে ওঠে, ওহে নাম দেখি,

দোলনাটা তোমার কেনা নয়। মিনু কিন্তু নামতে নারাজ, বলে, বাঃ আমি তো আগে এসেছি।

আগে এসে মাথা কিনেছ নাকি? বেলা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—তুমি একাই শুধু দোল খাবে? ভারি একটা নূতন শাড়ী প'রে এসে আবদার যে ধরে না! ওরে এমন শাড়ী তোরা দেখেচিস কখনও?

মিনুর শাড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে, সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে বেলা হাসতে সুরু করে।

বেলার দলের আর একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ বুঝি তোর সেই দাদু কিনে দিয়েচে, মিনু?

মিনু বলে, না, এ শাড়ী হরিদাদা কিনে দিয়েচে।

বেলার মুখে আবার বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠে, চোখ দুটো বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বড় বড় করে সে বলে, ও বাবা, একা দাদুতে রক্ষে নেই, আবার হরিদাদা! তা সে দাদু গেল কোথায়, হারিয়ে গেল নাকি, এরি মধ্যে?

মিনু জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়, কেন হারিয়ে যাবে? সে দাদুও আছে। তাঁর নাম রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরী।

রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরীর বাড়ীটা স্কুল থেকে খুব দূরে নয়। গাড়ীতে আসতে আসতেই প্রকাণ্ড বাড়ীখানা অনেকের চোখে পড়েচে। তাই মিনুর কথা শুনেই মেয়েদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, ওরে, শোন্, শোন্, রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরী নাকি ওর দাদামশাই। চাল মারবার আর জায়গা পায় নি।

আমি মিথ্যে কথা বলি না। উনিই আমার দাদামশাই, মিনু বেশ স্পষ্টভাবেই কথাগুলো বলে। সেই মেয়েটা কিন্তু বিশ্বাস করতে চায়না, বলে, তাই নাকি? তবে হবে। কিন্তু রায়বাহাদুরের বাড়ী আমাদের

বাড়ীর কাছেই কিনা। বুড়োর তিন কুলে কেউ আছে বলে জানতাম না।

বেলা মিনুকে জব্দ করবার সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, বলে তা মিনু একবার দাদুর কাছে গেলেই তো পারে। অত বড়লোক দাদু, কি আদরটাই না করবে মিনুকে।

সেই মেয়েটা ফোড়ন দেয়, আজই চল না, দেখব তোর কেমন দাদু!

বেশ, আজই যাব, দেখিস।

মিনু সগর্ব্বে সেখান থেকে চলে যায়।

যে মেয়েটির বাড়ী রায়বাহাদুরের বাড়ীর কাছেই, স্কুলের ছুটির পর বাস থেকে নামবার সময় সে মিনুকে বলে, কই, নামলিনে মিনু, দাদামশায়ের কাছে যাবি না? এই তো তোর দাদুর বাড়ী—

আঙুল দিয়ে মেয়েটা রায়বাহাদুরের বাড়ীটা দেখিয়ে দেয়। প্রকাণ্ড বাড়ী আর প্রকাণ্ড তার গেট। গেটের পাশেই শ্বেত পাথরের উপর নাম লেখা—রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরী।

মিনুর বুক ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কতদিন—কতদিন সে এমনি প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু এত বড় তা সে ভাবতেও পারে নি! এর মধ্যে সে যাবে কি করে? কিন্তু বেলার দল এক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে মজা দেখচে। মিনুর ইতস্ততঃ করলে চলবে না, নামতেই হবে তাকে এখানে। শ্লেট আর বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে মিনু কোন রকমে বাস থেকে নেমে পড়ে।

মিনুর পা দুটো যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে, কিন্তু ফিরে গেলে

চলবে না, গেটের মধ্যে তাকে ঢুকতেই হবে, আর প্রমাণ করতে হবে নিজের পরিচয়। সেই মেয়েটা এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে [illegible] তাই লক্ষ্য করচে।

মিনু এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রেই গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

মিনু সত্যি সত্যিই ভিতরে ঢুকে পড়ায় মেয়েগুলি প্রথমটা রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

একজন বলে, আরে সত্যি সত্যি যাচ্চে যে!

বেলা বলে, দাঁড়ানা, এখুনি দারোয়ান গলা ধাক্কা দিয়ে [illegible] দেবে, তখন বুঝতে পারবে—দাদুর আদর কি রকম।

বেলার কথায় তার সঙ্গিনীরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। একজন তো বলে দাঁড়িয়ে একটু মজা দেখা যাক, কি বলিস? যে মেয়েটির বাড়ী রায়বাহাদুরের বাড়ীর কাছেই সে বলে, না, না, স্কুলের গাড়ী এতক্ষণ দাঁড়াবে কেন? আমাদের বাড়ী থেকে রায়বাহাদুরের বাড়ীর প্রায় সবটাই দেখা যায়। চল্‌না সবাই আমার বাড়ীতে, সেইখান থেকেই বসে বসে সব মজা দেখা যাবে—

বলা বাহুল্য তার এই প্রস্তাবে সবাই রীতিমত উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং কলরব করতে করতে গাড়ী থেকে নেমে যায়।

এদিকে গেটটা পার হ'তেই মিনুর বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। দু-পাশে বাগান, মাঝখানে লাল সুরকী বিছানো চওড়া রাস্তা অনেকদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে; আর পথটা যেখানে শেষ হয়েচে—বাড়ী আরম্ভ হয়েচে সেইখান থেকে। এদিকে ওদিকে চারিদিকে চেয়ে মিনু কাউকেই দেখতে পায় না, উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। মনে হয়, সে যেন হঠাৎ এক ঘুমন্তপুরীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েচে।

কিন্তু ফিরে যাওয়া চলবে না, কিছুতেই না। স্কুলের বাসটা আর

পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটা হয়তো এখনো দাঁড়িয়ে আছে। মিন্থু জোরে জোরে পা ফেলে সুরকী বিছানো পথের উপর দিয়ে ভিতরের দিকে এগোতে থাকে। খানিকটা গিয়েই দেখে, বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা লোক—ঝাঁঝরি ক'রে ফুলগাছগুলোয় জল দিচ্চে।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে মিন্থু লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে, এই—শুনচো, এ বাগান রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরীর ?

মিন্থুর প্রশ্নে একটু যেন অবাক হয়েই লোকটি তার দিকে চায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, হ্যাঁ, এই তার বাগান। তোমার কি দরকার তাকে খুকুমণি ?

আমার দরকার, মিন্থু মরিয়া হয়ে বলে ফেলে তিনি আমার দাদামশাই—

কৌতুক আর বিস্ময়ে লোকটির চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কথাটা যেন ঠিক শুনতে পায়নি এমনিভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, কি বললে, তোমার দাদামশাই ?

হ্যাঁ, কোথায় তিনি বলতো ? মিন্থু এবার বেশ জোরে জোরে কথা বলে, একবার দেখতে পেলে হয়, আমি তখন বুঝিয়ে দেব তাঁকে।

লোকটি এবার একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে মিন্থুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, আর আকাশ পাতাল কত কি যেন ভাবে। কিন্তু শুধু মিনিটখানেকের জন্য। তারপরেই মিন্থুর দিকে এগিয়ে এসে বলে, তা বুঝিয়ে দিও দিদি, কিন্তু তিনি তো বাড়ী নেই—

বাড়ী নেই ! তাহলে···হতাশায় মিন্থুর কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ে।

তাতে কি হয়েচে খুকু ? লোকটি এবার মিন্থুর একটি হাত ধ'রে বলে, এস, তোমার দাদুর বাড়ী দেখবে না ?

কে দেখাবে ? মিন্থু জানতে চায়।

লোকটি হেসে জবাব দেয়, কেন আমি! বুড়োর সব জিনিসের আমিই তো দেখা শুনো করি···

মিন্নুকে নিয়ে লোকটি এবার বাড়ীর দিকে এগোয়।

অদূরবর্ত্তী একটি বাড়ীর ছাদে বেলার দলের মেয়েগুলির চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে।

একজন বলে, আরে, বুড়োটা ওকে ভিতরে নিয়ে চললো যে!

বেলা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে জবাব দিলে, ও নিশ্চয়ই রায়বাহাদুর নয়!

যাদের বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে এই জটলা হচ্ছিল সেই মেয়েটি বলে, নারে, ওই বুড়োই রায়বাহাদুর—আমি ওকে চিনি, সংসারে ওর কেউ নেই বাবা বলেন—

বেলা যেন আশ্বস্ত হয়ে বলে, তাই বল্। ওকে দেখে বোধহয় রায়বাহাদুরের একটু দয়া হয়েচে। কিছু খেতে দেবেন বোধহয়, কিম্বা দুচারটে পয়সা। ব্যাপার বোঝা গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চল যাই—

বেলা হঠাৎ বাড়ী যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং তার মুখটা যেন একটু গম্ভীর দেখায়।

বাগানটুকু পার হ'য়ে বাড়ীর মধ্যে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ! কিন্তু সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই রায়বাহাদুরের মন যেন অতীতের ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রেতের মত ঘুরে বেড়ায়। আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে সুমিত্রা যেদিন তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে অনায়াসে চলে গিয়েছিল, সেদিনের কথাটাই বিশেষ করে মনে পড়ে। তারপর থেকে এই দীর্ঘকাল তিনি এই প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে সত্যিই নিঃসঙ্গ প্রেতের

মত কাটিয়েচেন; ব্যাঙ্কের হিসেব, কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের মিটিং···এই সব বড় বড় আর রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে তাঁর দিন কেটেছে সত্যি, কিন্তু ছোটখাট কথা, সহজ কথা বলার মত একটি লোকও তিনি খুঁজে পাননি! তাই আজ বাগানের মধ্যে ছোট একটি মেয়ের মুখে নিজের নাম শুনে, তার দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর আশ্চর্য্য হ'বার চেয়ে খুসী হয়েছিলেন বেশী। আর খানিকক্ষণ পরে একথাও তাঁর বুঝতে বাকী ছিল না যে, এই মেয়েটি তাঁর কাছে এসেছে সুমিত্রার ছোট বেলার প্রতিনিধি হয়ে—সহজাত অধিকার আর দাবী নিয়ে।

বাড়ীর আসবাবপত্র দেখে মিনু বিস্ময়ে একেবারে অবাক হ'য়ে যায়। রায়বাহাদুর মিনুর হাত ধ'রে একটির পর একটি ঘরে ঘুরে বেড়ান, অবশেষে তাকে নিয়ে আসেন নিজের ঘরটিতে। ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা খাট, পাশেই ছোট্ট একটি টিপয় আর একখানা ইজি চেয়ার। ছবি, আলমারী বা ড্রেসিং টেবল···আর কিছুই নেই।

রায়বাহাদুর বলেন, এই তোমার দাদুর ঘর।

খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে মিনু বলে, এই খাটে দাদু শোয়?

রায়বাহাদুর ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন যে মিনুর অনুমান সত্যি। একটার পর একটা ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়াতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ইজি চেয়ারটায় বসে তিনি একটা হাঁফ ফেলেন।

ঘরের চারিদিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিনু বলে, দাদু তো মস্ত বড়লোক, কিন্তু ঘরে তো ভাল জিনিস কিছুই নেই।

তাও তো বটে—রায়বাহাদুর একটু অন্যমনস্কভাবে জবাব দেন।

দাদু বোধহয় খুব কেপ্পন, না?

তাই হবে বোধহয়—রায়বাহাদুর হাসবার চেষ্টা করেন।

খাটটীর দিকে চেয়ে চেয়ে মিনু বলে, বাবাঃ, কি লম্বা খাট! দাদু বুঝি খুব লম্বা?

হ্যাঁ, যেমন লম্বা, তেমনি বিশ্রী—রায়বাহাদুর জবাব দেন।

এঃ, দাদু বিশ্রী বইকি! কখখনো নয়। মিনু সজোরে ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়। রায়বাহাদুর কৌতুকের সুরে বলেন, বাঃ, হ'লোই বা বিশ্রী, তাতে তোমার কি! তোমার তো দাদুর ওপর রাগ।

মিনু বলে, হলেই বা রাগ, তা বলে দাদু বিশ্রী হতে যাবে কেন?

রায়বাহাদুর বলেন, আচ্ছা, তা হলে বিশ্রী নয়। কিন্তু খুব খারাপ লোক, কেমন?

মিনু একটু চুপ করে থেকে বলে, হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

রায়বাহাদুর কোন জবাব দেবার আগেই মিনু দেখে, লোকটি ইজি চেয়ারের ওপর বসে। রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে, একি! তুমি যে দাদুর চেয়ারে বসেছ বড়!

অ্যাঁ!—ও, তাইত ভুলেই গেছি...

রায়বাহাদুর রীতিমত বিব্রতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

মিনু বলে, দাদু দেখলে খুব রাগ করতো?

তা করতো বই কি, রায়বাহাদুর বলেন।

মিনু যে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, তার বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে এই সময় একজন চাকরকে একটা গড়গড়া নিয়ে ঢুকতে দেখা যায়। সেই দিকে চোখ পড়তেই রায়বাহাদুর যেন রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে চাকরটাকে চলে যেতে বলেন। চাকরটা কিন্তু হঠাৎ কিছুই বুঝতে পারে না, হতভম্বের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। রায়বাহাদুর এবার রীতিমত উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে লোকটাকে যাবার ইঙ্গিত করেন।

হঠাৎ মিনুর চোখ পড়ে যায় সেই দিকে। আশ্চর্য্য হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, কাকে তুমি হাত নাড়ছিলে?

ওই, ওই হতভাগা চাকরটাকে—রায়বাহাদুর উত্যক্তভাবে বলে ওঠেন, বেটার যদি কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে! যা ব্যাটা নিয়ে যা গড়গড়া, এখানে কে আছে যে তুই গড়গড়া এনেছিস খাতির করে?

বিস্মিত চাকরটা অস্ফুটকণ্ঠে বলে, আজ্ঞে আপনি...

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি—রায়বাহাদুর ঝাঝিয়ে ওঠেন। আমি বলছি, তুই নিয়ে যা এখান থেকে। যা, বেরো—

চাকরটা আসল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পারলেও, আর সেখানে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পায় না।

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে নিজের মনেই যেন বলেন, যেমন হয়েচে বাড়ীর মনিব, তেমনি চাকরগুলো। যত সব পাজি, বদমাস—

—বাঃ, ওর কি দোষ, ও হয়ত ভেবেছিল, দাদু এখানে আছে—মিনু চাকরটার পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে।

রায়বাহাদুরের রাগ যেন আরও বেড়ে ওঠে। তিনি বলেন অমন কথা ওরা ভাবে কেন? চোখে দেখতে পায় না? সব আহাম্মুখ, হু:—

মিনু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে বলে, আমি কিন্তু এবার বাড়ী যাব।

বাড়ী যাবে?

রায়বাহাদুর যেন স্বপ্নলোক থেকে একেবারে মাটীতে নেমে আসেন। মেয়েটির বাড়ী আছে, তাকে বাড়ী যেতে হবে, এ কথা যেন তাঁর মনে ছিল না। খানিক চুপ করে থেকে তিনি মিনতির সুরে বলেন, আর একটু থাকবে না?

মিনু বলে, না, মা আবার ভাববে।

তোমার মা ভাববে, না? প্রশ্নটা ক'রে রায়বাহাদুর যেন গভীর সমুদ্রে ডুবে যান। তারপর সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার মা বেশ ভাল আছে তো সেখানে? সেখানে কোন কষ্ট নেই তো?

মিন্টু জবাব দেয়, বাঃ কষ্ট আবার নেই। সমস্ত দিন—তারপর কত রাত পর্য্যন্ত মা সেলায়ের কলে বসে সেলাই করে—কষ্ট হয় না।

মিন্টুর মুখের এই সামান্য ক'টি কথাতেই রায়বাহাদুর বিচলিত হ'য়ে ওঠেন। মিন্টুর দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে, কোন রকমে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে তিনি বলেন, তোমার মা সারাদিন—অনেক রাত পর্য্যন্ত সেলাই করেন, না?

রায়বাহাদুরের চোখে জল এসে পড়ে। মিন্টু যাতে দেখতে না পায়, সেজন্য তিনি তাকে কোলের মধ্যে টেনে নেন। মিন্টু আশ্চর্য্য হ'য়ে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর রায়বাহাদুর বলেন, তুমি মাকে গিয়ে কোন কথা ব'লো না কিন্তু। মা তা'হলে বকবে হয়তো।

মিন্টু আরও অবাক হয়ে যায়। চুপ করে কি যেন ভাবে, তারপর বলে, কিন্তু মাকে যে কোন কথা লুকোতে নেই!

রায়বাহাদুর যেন নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে পড়ে বলেন, তাও তো বটে।

মিন্টু খানিক চুপ করে থেকে যেন সব সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলে, বলে, আচ্ছা, দাদুকে খুঁজতে আসার কথা বলবো না। বল্‌বো এক নতুন দাদুর সঙ্গে ভাব হ'য়েচে।

রায়বাহাদুর আশ্বস্ত ভাবে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ব'লবে। মাকে কিছু লুকোতে নেই।

একটু পরেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি আবার আসবে? তোমার নতুন দাদুকে দেখতে আসবে তো?

মিন্টু বলে, কি করে আসব! রোজ রোজ আমায় স্কুলের বাসে করে এখানে আসতে দেবে কেন? আজকের জন্যেই হয়ত কত বকুনী খেতে হবে।

মিন্টুর কণ্ঠস্বর রীতিমত ভারি হয়ে আসে।

রায়বাহাদুর বলেন, না, না, তোমায় বকুনি খেতে হবে না। তোমার জন্যে আমি যদি স্কুলে গাড়ী পাঠাই, তা হলে তুমি আসবে তো?

মিন্টু কথাটা আদৌ বিশ্বাস করতে পারে না, তাই বলে, যাঃ, মিছে কথা। আমায় ঠাট্টা হচ্ছে, না? কি করে তুমি গাড়ী পাঠাবে? কোথায় পাবে গাড়ী?

কোথায় পাব? তাই তো! রায়বাহাদুর যেন মস্ত বড় সমস্যার মধ্যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারপর হঠাৎ যেন সমস্যা সমাধান ক'রে ফেলেচেন—এমনিভাবে বলেন, আচ্ছা, তোমার দাদুর একটা মোটর তোমার জন্য পাঠিয়ে দিই যদি?

বারে! দাদুর মোটর তুমি কি করে পাঠাবে! দাদু জানতে পারলে তখন? মিন্টু রীতিমত জেরা সুরু করে দেয়।

রায়বাহাদুর তাকে আশ্বস্ত করেন, জানতে পারলে তো! তোমার দাদুকে জানতে দিচ্ছে কে?

মিন্টু কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হয় না। গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবে। তারপর বলে না, তবু আমি দাদুর মোটরে চড়বো না। কেন চড়বো অমন খারাপ দাদুর মোটর!

রায়বাহাদুর বলেন, আহা, দাদু অমন খারাপ বলেই তো তার মোটর যত পারা যায় চড়ে নেবে। সে কিপটে বুড়োর ত্রিভুবনে কে

আছে মোটর চ'ড়বার! মোটরে মরচে ধ'রে যাচ্ছে, তুমি চড়লে তার চোদ্দপুরুষ ধন্য হবে!

লোকটার যুক্তি যেন মিনুর মনে লাগে। সে বলে, সত্যি তাহ'লে মোটর পাঠাবে? আচ্ছা, দেখবো সত্যি না মিথ্যে।

—আচ্ছা, এখনই দেখবে চলো। তোমাকে মোটরে বাড়ী পৌঁছে দিক····

মোটরে চ'ড়বার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে মিনু যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখুনি আবার কি ভেবে বলে, না, না, আজকে না···

রায়বাহাদুর বলেন, তোমার কিছু ভাবনা নেই, খুকুমণি। ড্রাইভার তোমাদের বাড়ী থেকে একটু দূরে চুপি চুপি নামিয়ে দেবে। কেউ টেরও পাবে না। কেমন, রাজী তো?

মিনু কি যেন ভাবতে ভাবতে জবাব দেয়, আচ্ছা, কাল কিন্তু পাঠাতে হবে স্কুলে। দেখব তোমার কথা ঠিক কি না।

আচ্ছা গো! আচ্ছা গো! রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বলেন, তুমি দেখো, তোমার নতুন দাদুর কথার ঠিক থাকে কি না।

মিনুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এবার নীচে নেমে আসেন। তারপর ড্রাইভারকে ডেকে মিনুদের বাড়ীর রাস্তাটা বুঝিয়ে দেন। উৎসাহ আর উত্তেজনায় বিহ্বল মিনু মোটরে উঠে বসে। কিন্তু আজ স্কুল বন্ধ হ'বার পর থেকে যা' ঘটেচে তা' যে সত্যি একটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। মনে হয়, সে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখচে, আর মোটরটা তাদের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই এ-স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

রায়বাহাদুর নিজেই মোটরের দরজাটা বন্ধ করে দেন, তারপর বলেন, আচ্ছা, আবার কাল দেখা হ'বে দিদিমণি, কেমন?

মিনু স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়, আচ্ছা—

মোটর চলতে সুরু করে, তারপর গেট্ পার হ'য়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। রায়বাহাদুর তারপরেও কতক্ষণ চুপ করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। আশপাশ থেকে চাকর বেয়ারাগুলো বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাঁর ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করে।

বাড়ীর মধ্যে ফিরে এসেই রায়বাহাদুর যে চাকরটাকে সামনে পান তাকেই ধমক দিয়ে ওঠেন, হতভাগা সব। এই আজ থেকে ব'লে রাখলাম, এই ছোট দিদিমণি যখন আসবে, তখন আমি হুজুর নই, সাহেব নই, কিছু নই—বুঝেচিস ?

চাকরটা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে, 'হাঁ কিম্বা না' কিছুই বলতে পারে না।

অদ্ভুত একটা উত্তেজনার মধ্যে মিনু সে রাতটা কাটায়—মাঝে মাঝে মনে হয়, আজ বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার সময় যা' ঘটেচে, তা' সত্যি নয়, স্বপ্ন। দাদুর বাড়ীর সেই লোকটা যদি সত্যিই তার স্কুলে তাকে আনবার জন্যে গাড়ী পাঠিয়ে দেয় তাহ'লে কি মজাই যে হবে, সে কথা ভাবতে ভাবতে মিনু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না মিনুর চোখে, এক একবার ভাবে মাকে ঘুম থেকে তুলে সব কথা বলে ফেলে। তখনই ভয় হয়, মা যদি রাগ করেন।

এমনি করেই মিনু কোন রকমে রাতটা কাটায়।

তারপর স্কুলে।

সমস্তক্ষণ মিনু যে কি অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে কাটায়, তা' শুধু সেই জানে। তারপর এক সময় ছুটির ঘণ্টা বাজে। মেয়েদের দল একে

একে বাড়ী যাবার জন্য স্কুল থেকে বা'র হয়। মিনু স্কুল থেকে বের হয় সকলের শেষে, পা যেন তার চলতে চায় না। দাদুর বাড়ীর সেই লোকটা সত্যিই যদি গাড়ী না পাঠিয়ে থাকে?

বেলাদের দলই আগে বেরিয়েছিল এবং বেলার জন্যে তাদের বাড়ীর ছোট্ট মোটরখানাও এসে দাঁড়িয়েছিল গেটের কাছেই। রাণীদি'ও আসছিলেন তাদের সঙ্গে। বেলা মোটরে ওঠবার সময় রাণীদির দিকে চেয়ে বলে, চলুন না দিদিমণি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

রাণীদি বেশ খুশী এবং গর্ব্বিত হ'য়েই মোটরে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ক্রাইসলার গাড়ী এসে দাঁড়ায় সেইখানে। পাগড়ী পরা তকমা আঁটা ড্রাইভার গাড়ীটা থামিয়ে দারোয়ানকে বলে, মিনু দিদিকো খবর দিজিয়ে, গাড়ী আয়া—

মিনুদিদির জন্য গাড়ী! কে মিনু দিদি! দারোয়ন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ড্রাইভারের দিকে তাকায়। রাণীদিও যেন কথাটা বিশ্বাস ক'রতে পারেন না, জিজ্ঞাসা করেন, কার গাড়ী বল্লে? মিনুর?

ড্রাইভার রাণীদিকে সেলাম করে জবাব দেয়, হাঁ মাইজী।

রাণীদি থেকে আরম্ভ করে বেলা পর্য্যন্ত কেউই যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না, এমন সময় সকলের পিছনে থেকে মিনুকে এই দিকে আসতে দেখা যায়। তার দলের মেয়েগুলি উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, মিনু, মিনু! তোর গাড়ী এসেচে, মস্ত বড় গাড়ী!

গাড়ী এসেছে! উত্তেজিত মিনু দ্রুত পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসে। সে গাড়ীর কাছে পৌঁছুতেই ড্রাইভার রীতিমত সম্ভ্রমের সঙ্গে সেলাম জানায়। তারপর খুলে দেয় গাড়ীতে ওঠবার দরজাটা। মিনু হাসিমুখে গাড়ীতে উঠে বসে।

রাণীদি যেন নিজের চোখে দেখেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেন না, হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে থাকেন।

বেলা বলে, আসুন দিদিমণি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

না, আজ থাক বেলা—

রাণীদি হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ীর দিকে পা বাড়ান।

রায়বাহাদুর যেন মিনুর অপেক্ষাতেই গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মোটরটা এসে দাঁড়াতে তিনি নিজেই ব্যস্ত হয়ে দরজাটা খুলে দেন।

মিনু মোটর থেকে নামতে নামতে বলে, সত্যি সত্যি মোটর আসবে আমি ভাবতে পারিনি।

আর তুমি যে সত্যি সত্যি আসবে আমিও ভাবতে পারিনি। এস দিদি এস—

মিনুর হাত ধরে তিনি ভিতরে নিয়ে যান, একেবারে তাঁর ড্রইং-রুমে। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের টেবলটার ওপর বিলিতি চকোলেটের কয়েকটা বাক্স, কতকগুলো বড় বড় পুতুল আর এক[illegible] ফুল। সেদিকে চেয়ে মিনুর যেন বিস্ময় আর আনন্দের অন্ত থাকে না। মিনুর আনন্দের ছোঁয়া লেগে যেন রায়বাহাদুরের মনেও খুশীর জোয়ার লাগে।

মিনু বলে ওঠে, একি, এসব কোথা থেকে এলো !

বিস্ময়ের ভাণ করে রায়বাহাদুর বলেন, তাই ত, বুঝতে পারচি না ত ! কাল রাত্রে কোন পরী বোধহয় এখানে রেখে গেছে—

মিনু কথাটা বিশ্বাস করে না, বলে, আহা পরীরা বুঝি চকোলেট খায় ! পরীরা বুঝি এমনি বিলিতি পুতুল আনতে পারে !

—'পরীরা ইচ্ছে করলে সব পারে, এমন কি তোমার মত ছোট্ট মেয়ে হয়েও আসতে পারে।' মিন্থুর মুখের দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা তুমি সত্যি পরী নও তো? আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে।

—বাঃ, ঠাট্টা হচ্ছে! সত্যি বল না এ-সব কার? কে এনেছে? মিন্থু যেন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বলেন, কে এনেচে বলতে পারি না; তবে এগুলো সব তোমার।

আমার! মিন্থু যেন নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না, বলে, না, না, আমার হবে কেন? আমি এসব নিয়ে কি ক'রবো?

—এই বুড়ো নতুন দাদুকে খুশী ক'রবে।

—কিন্তু আমায় কি নিতে আছে? আমি কি এইজন্যেই এসেছি?

—জানি, তুমি তোমার দাদুকে খুঁজতে এসেচ, কিন্তু সে ত আজও বাড়ী নেই।

মিন্থু বোধহয় মনে মনে কল্পনা করেছিল, তার সত্যিকার দাদুই তার জন্যে এসব এনে রেখেচে। তাই রীতিমত ক্ষুণ্ণভাবে সে বলে, বাঃ, দাদু বুঝি কোনদিনই বাড়ী থাকে না? আমি তা হলে আর আসব না।

রায়বাহাদুর অভিমানের স্বরে বলেন, তোমার সেই খারাপ, দুষ্ট দাদুই সব হ'ল! আর আমি বুঝি কিছুই না।

বাঃ আমি বুঝি তাই বলচি! মিন্থু যেন একটু লজ্জিতভাবেই জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, সত্যি তুমি এখানে কি করো? দাদু তোমার কে হ'ন?

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে জবাব দেন, তোমার দাদু, তোমার দাদু আমার শত্তুর।

—বাঃ, তা হ'লে তুমি এখানে থাক কেন?

—থাকি কেন? থাকি একদিন যদি তোমার দাদুকে জব্দ করে শোধ নিতে পারি, সেই আশায়।

মিনু হাসতে হাসতে বলে, দাদুর সঙ্গে তুমি পারবে কেন? দাদু কত বড়লোক!

মিনু মনে-মনে ভেবেছিল, লোকটি এবার নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রায়বাহাদুর বলেন, হোক বড়লোক। তুমি যদি আমার দিকে থাক, তাহলে তোমার সে দাদুকে আর আমার সঙ্গে পারতে হয় না।

বা'রে! আমি থাকলে কি করে হবে! আমি তো এইটুকু ছোট্ট মেয়ে!

মিনু কিছুই ঠিক বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা তার পক্ষে যেন আরও ঘোরাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, রাতদুপুরে হঠাৎ সে একটা আজবপুরীর মধ্যে ঢুকে পড়েচে, দেখা দিচ্ছে—রহস্যের পর রহস্য, আর কোনটার কিনারা করা যাচ্চে না।

অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মিনু বলে ওঠে, ওই যাঃ, ভুলে একটা চকোলেট্ খেয়ে ফেলেছি!

রায়বাহাদুর মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করবার চেষ্টা করে বলেন, তাইত, ভারি অন্যায় করে ফেলছ! তা'হলে এবার জেনে শুনেই সবগুলো খেয়ে ফেলো, আর যা' খেতে পারবে না তা' বাড়ী নিয়ে যাও—

মিনুর সব দুশ্চিন্তা যেন হালকা মেঘের মত এক নিমিষে কোথায় ভেসে যায়। চকলেটের বাক্সগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলে, তুমি যদি আমার সত্যি দাদু হতে তা হ'লে কিন্তু বেশ হতো!

—তেমন ভাগ্য কি আর করেছি! রায়বাহাদুরের গলাটা হঠাৎ কেন ধরে যায় কে জানে। মুখটা তিনি মিন্নুর দিক থেকে ফিরিয়ে নেন।

একটু চুপ করে থেকে রায়বাহাদুর আবার বলেন, আর আমি তোমার সত্যি দাদু হলে, তোমার মা হয়ত খুশী হতেন না!

কথা বলতে বলতে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর আরো ভারি হয়ে যায়। মিন্নু বলে, বাঃ, মা কেন খুসী হবেন না? মা কত ভাল তুমি জানো না।

—তা জানি না বটে! তোমার মার সঙ্গে তো আর দেখা হ'ল না—রায়বাহাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে ফেলেন।

—কি করে হবে, মা তো আর এখানে আসবে না, মিন্নু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মাকে দেখবে?

রায়বাহাদুর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান।

মিন্নু বলে, তাহলে কিন্তু টিকিট কিনতে হবে।

—টিকিট কিনতে হবে—মাকে দেখতে? রায়বাহাদুর রীতিমত অবাক!

মিন্নু ঘাড় নেড়ে বলে, আহা, মাকে দেখতে কেন! তোমার একটুও বুদ্ধি নেই! আমাদের স্কুলে একটা চ্যারিটি শো হচ্চে, তারই টিকিট। মা দেখতে যাবেন কি না। তুমিও যাবে!

কথাগুলো বলতে বলতেই কি যেন একটা মিন্নুর মনে পড়ে যায়। মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করে সে বলে, নাঃ, সে-ও তো হবে না।

—কেন বলতো? রায়বাহাদুর রীতিমত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন।

—দিদিমণি বলছেন, কুড়ি টাকার টিকিট বিক্রী না করতে পারলে

আমায় পার্ট দেবেন না। অত টিকিট আমি কি করে বিক্রী করবো! মা-র ত যাওয়াই হবে না।

আশাভঙ্গের ব্যথায় মিনুর চোখ দুটি ছল ছল করে।

রায়বাহাদুর বলেন, বলো কি এই কটা টিকিট বিক্রির জন্যে আবার ভাবনা! আমার যত চেনা লোক আছে, তারা সবাই এই রকম চ্যারিটি শো দেখবার জন্যে পাগল। টিকিট কোথাও বিক্রী হচ্চে একবার জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।

মিনু যেন তবু বিশ্বাস ক'রতে পারে না; বলে, এরা দশ আর দশ কুড়ি টাকার টিকিট কিন্‌বে?

কিন্‌বে মানে লুফে নেবে! দশ আর দশ কুড়ি টাকা কেন? কুড়ি আর কুড়ি চল্লিশ—

রায়বাহাদুর নিজেই যেন উৎসাহে খাড়া হ'য়ে ওঠেন।

মিনুর উৎসাহের অন্ত থাকে না। টিকিট বিক্রীর খাতাখানা তাড়াতাড়ি বা'র করে সে বলে, এই যে টিকিট বিক্রীর খাতা, তুমি তাহ'লে ক'খানা বিক্রী ক'রে দেবে বলো?

মিনুর হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে রায়বাহাদুর নিজের পকেটে পুরে ফেলেন।

মিনু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওকি···

রায়বাহাদুর বলেন, সব ক'খানাই আমার রহিল।

সব কখানা! মিনুর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে ওঠে।

—ওযে অনেক টাকার টিকিট?

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থাকেন, তারপর হাসতে হাসতে বলেন, তুমি পার্ট করবে, তোমার মা দেখতে আসবেন, তার টিকিটের দাম কি টাকায় হয়!

—সত্যি ওরা এমন অবাক হবে! শো কবে জানতো, এই ২৪শে। ভুলো না যেন!

মিনু যেন খুশী আর চেপে রাখতে পারে না।

রায়বাহাদুর বলেন, ও তারিখ কি আর ভোলা যায়!

অবশেষে একদিন সেই তারিখটি এসে পড়ে—মিনু যে তারিখটির কল্পনায় ক'দিন রাত্রিতে ভাল করে ঘুমোতে পারে নি, আর সুমিত্রা দশ তারিখের প্রতীক্ষায় দীর্ঘ দশ বছর ধরে মনে মনে দিন গুণেছে।

রান্নার পালাটা কোন রকমে চুকিয়ে ফেলেই সুমিত্রা হরিহরকে বলে, মিনুকে এখুনি স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্চি হরিকাকা, ও যেন কিছু বুঝতে না পারে—

হরিহরের কথাটা ভাল লাগে না। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেন, কিন্তু…ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে হ'ত না? আজকের এমন দিনে মিনু সঙ্গে থাকবে না, এ আমার ভাল লাগচে না। এই একরত্তি মেয়ে কিই বা বুঝবে?

সুমিত্রা বলে, তুমি বুঝতে পারচো না, হরিকাকা। ওই একরত্তি মেয়ে আজ কিছু বুঝতে না পারুক, ওর মনে আজকের ছবি ছাপা হয়ে থাকবে। সেটুকুও আমি চাই না।

সুমিত্রার মুখে সকাল সকাল স্কুলে যাবার কথা শুনে মিনু কিন্তু একেবারে বেঁকে দাঁড়ায়।

—এত সকাল সকাল আমি কিন্তু মা স্কুলে যাব না।

সুমিত্রা বলে, তাতে কি হয়েছে মা। আজ তোমাদের প্লে—সকাল সকাল একটু যেতেই হয়।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আসল কথাটা মিমু কল্পনাই করতে পারে না। বলে, বাঃ, এত সকাল সকাল গেলে সবাই ভাববে, ভারি একটু ভালো নাচের পার্ট পেয়েছে কি না; তাই একেবারে আদেখলার মত দরজা খুলতে না খুলতেই স্কুলে ছুটে এসেচে—

—না মা, তা ভাববে কেন? বরং সবাই প্রশংসা করবে। ভাববে ভাল পার্ট পেয়ে ভাল করবার আগ্রহ তাই—

মিমু এবার কতকটা নরম হয়ে বলে, বেশ ... হ'লে তোমরাও চলো এখন।

—আমরা যাব—নিশ্চয়ই যাব, এই একটু বাদে ... ব। বিব্রত ভাবটা লুকোবার জন্যে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আয় দেখি তোর চুলটা ঠিক করে দিই, আর একবার।

মিমু সুমিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায়। চুলটা ওর ঠিকই ছিল, তবু চিরুণীখানা নিয়ে সুমিত্রাকে একটু রকমফের করতে হয়—আর চোখের জলটাকে কত কষ্টে চেপে রাখতে হয় তা শুধু সেই জানে।

হরিহর যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মিমুকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সেই নতুন দাদু আসবে তো, মিমুদিদি?

নিশ্চয় আসবে—মিমু একটু গর্ব্বিত ভাবেই জবাবটা ... হরিহর বলেন, তা হ'লে তো আমাদের না গেলেও চলবে?

মিমু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, বাঃ, তা কি করে হবে? নতুন দাদু তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আসবে। তোমরা ঠিক যাবে তো মা?

সুমিত্রা বলে, যাব রে যাব।

হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের পাতাটার ওপর মিমুর চোখ পড়ে—আজকের তারিখটার ওপর পেন্সিলের একটা মোটা দাগ কাটা!

মিন্থু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, তারিখটায় দাগ দিয়েচ কেন মা ?

বিব্রত স্থমিত্রা কি যে ব'লবে ঠিক করতে পারে না।

—আজ তোমাদের নাচের দিন কি না, দিদি—তাই পাছে ভুলে যায় বলে মা দাগ দিয়ে রেখেচে—হরিহর বলে ওঠেন।

তার নাচ দেখবার জন্ত মা'র এতখানি আগ্রহের পরিচয় পেয়ে মিন্থু খুসি হয়ে ওঠে।

ওঃ, তাই বুঝি ? তা হলে আমি যাই মা।

চলো হরিদা—

চলো দিদি—

হরিহর মিন্থুর সঙ্গে যাবার উপক্রম করতেই স্থমিত্রা বলে, তুমি ওকে স্কুলে পৌছে দিয়েই চ'লে এসো, হরিকাকা। সময় আর বেশী নেই—

হরিহর এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, সে আর আমায় বলতে হবে না।

মিন্থুর চলে যাবার পর স্থমিত্রা কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ শিশিরের জেল থেকে খালাস হবার দিন—হরিহর দিন পনের আগেই খবর নিয়ে এসেছিলেন। স্থমিত্রা তখনই ক্যালেণ্ডারের পাতায় দাগ দিয়ে রেখেচে ; কিন্তু মিন্থুকে সে কথা ব'লতে পারে নি, ইচ্ছে করেই বলে নি। কারণ, শিশিরকে খুনের দায়ে জেল খাটতে হয়েচে এ কথাটা সে কিছুতেই জানতে দেবে না। স্থমিত্রা জানে, কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে শিশিরকে এই দীর্ঘ দশ বছর দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েচে, কিন্তু সে কথা মিন্থু বুঝবে কি করে ?

মিন্থুকে স্কুলে পৌছে দিয়ে ফিরে এসেই হরিহর স্থমিত্রাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন—জেল-ফটকে উপস্থিত থাকবার জন্তে।

ফটকের একটু দূরে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে

হরিহর একেবারে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ান ; সুমিত্রা বসে থাকে গাড়ীর মধ্যে—জেল-ফটকের দিকে চেয়ে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। খানিক পরেই শিশির ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ায় ; হরিহর তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান—ভাড়াটে গাড়ীটার দিকে।

সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে শিশিরের মুখে দশবছর পরে আবার হাসি ফুটে ওঠে, আর সুমিত্রা দশ বছর ধরে যে চোখের জল লুকিয়ে রেখেছিল, তা' আর কোন বাধাই মানতে চায় না !

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথাই বলতে পারে না, দুজনে শুধু দুজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে !

হরিহর বলে ওঠেন, এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে ? ওদিকে আবার মিনুদিদির স্কুলে নাচ-গান দেখতে যেতে হবে—সে খেয়াল আছে ?

—মিনুর স্কুলের নাচ-গান। সে আবার কি ? শিশির যেন কিছু বুঝতেই পারে না।

হরিহর বলেন, সে মস্ত ব্যাপার ! চলো বাড়ী হয়ে আমরা মিনু-দিদির স্কুলেই যাব। সেইখানেই তার সঙ্গে দেখা হবে।

বাড়ী হয়ে জামা-কাপড় বদলে মিনুদের স্কুলে পৌঁছতে ওদের খুব বেশী দেরী হ'ল না। হরিহর সেই ভাড়াটে গাড়ীটাকেই দাঁড় করিয়ে রেখে তা'তেই সুমিত্রা আর শিশিরকে স্কুলে নিয়ে গেলেন।

অভিনয় তখন সুরু হয়ে গেছে। খানিক পরেই এল মিনুর নাচের দৃশ্য। সঙ্গে ছোট মেয়েদের গান। নাচ, আর গান শেষ হবার সঙ্গে

সঙ্গেই যবনিকা পড়লো, আর চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো করতালি আর আনন্দ কলরবে। তারই মাঝখানে শিশির বলে ওঠে, আমি, আমি তোমায় সত্যি কথা বলবো সুমিত্রা? আমি এখনও সব বিশ্বাস করতে পারচি না।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলে, আচ্ছা, মিনু এসে কি ভাববে বলতো? তাকে কিছু বলোনি ত?

সুমিত্রা বলে, না, আজ তুমি আসবে তা কিছু বলিনি।

হরিহর বলেন, জানলে মিনুদিদি বোধহয় স্কুলের নাচেও আসতো না।

খানিক পরেই মিনু এসে পৌছয় মা'র কাছে—প্রায় ছুটতে ছুটতে। তারপর সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে, খারাপ হয়নি তো মা?

সুমিত্রা কোন জবাব দেবার আগেই হরিহরের দিকে চেয়ে বলে, বলো না হরি-দা খারাপ হয়েচে?

হরিহর গম্ভীরমুখে বলেন, খারাপ তো হয়েইছে, নইলে সবাই এত হাততালি দেয়!

শিশির এতক্ষণ স্নেহমুগ্ধ চোখে চেয়েছিল মিনুর মুখের দিকে। হরিহর তার দিকে চেয়ে মিনুকে জিজ্ঞাসা করেন, কে বলতো মিনু-দি?

মিনু এতক্ষণে শিশিরের দিকে চাইবার অবকাশ পায়। কিন্তু সে দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন আর কথাই বলতে পারে না।

সুমিত্রা বলে, চিনতে পারছো না, মিনু?

বিস্ময় আর আনন্দে বিহ্বল মিনু কোন রকমে বলতে পারে, পেরেছি। একটু চুপ করে থেকে বলে, বাবা। নয় মা?

শিশির সস্নেহে মিনুকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, কি করে চিনলে বলো তো?

বাঃ, ফটো আছে যে!

আনন্দে আর পরিতৃপ্তিতে শিশিরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রারও। হরিহর বলেন, মিন্নুদিদিকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়।

সুমিত্রার দিকে চেয়ে মিন্নু জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো আগে বলো নি মা। তুমি বুঝি জানতেও না বাবা আজ আসবে।

সুমিত্রা হাসি চাপতে চাপতে জবাব দেয়, কই আর জানতাম।

মিন্নু একটু চুপ করে থেকে বলে, আমার নতুন দাদুর সঙ্গে ভাব করবে না মা? নতুন দাদু এসেচে যে!

—নতুন দাদু! সে আবার কে? বিস্মিত শিশির জানতে চায়।

জবাবটা দেন হরিহর। সে আমাদের মিন্নুদির এক নতুন বন্ধু। রাস্তায় কেমন করে আলাপ হয়েছে। এখন আমাদের চেয়ে সেই মিন্নুদির অনেক বেশী আপনার লোক!

হরিহর হেসে ওঠেন, সুমিত্রা-ও সে হাসিতে যোগ দেয়।

মিন্নু বলে, হরিদার যত বাজে কথা! নতুন দাদুকে আনবো মা? আনবো বাবা এখানে?

শিশির বলে, নিশ্চয়ই আনবে। কই, কোথায় তিনি?

সুমিত্রা মিন্নুর মুখে নতুন দাদুর কথা অনেক শুনেচে, কি[illegible] সত্যি তিনি যে কে, তা অনুমান করতে পারেনি। শিশিরে[illegible]ঙ্গে সে-ও উৎসুক হয়ে মিন্নুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শিশির-সুমিত্রা-হরিহর যেখানটায় বসেছিল, তার ঠিক বিপরীত দিকের একটা আসনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে মিন্নু বলে ওঠে, ওই যে, ওই—

শিশির, সুমিত্রা আর হরিহর সেইদিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, মিন্নুর নতুন দাদু আর কেউ নয়—স্বয়ং রায়বাহাদুর চুনীলাল চৌধুরী।

মাথার চুলগুলি তার সাদা হয়ে গিয়েছে, রূপো-বাঁধানো লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে তিনি তাদের দিকেই চেয়ে আছেন! তাঁর সেই সাগ্রহ দৃষ্টিতে কি কাতর, করুণ ব্যাকুলতা! তিনি যেন নিঃশব্দে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছেন।

মিন্থু আশা করছিল, দাদুকে দেখিয়ে দেবার পর, এরা সবাই এগিয়ে যাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলো না। তার বদলে শিশিরের মুখটা এমনি অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে ওঠে যে, মিন্থু রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

শিশির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, এস।

সুমিত্রা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে হরিহরও।

মিন্থু কিছুই বুঝতে পারে না। অসহায়ভাবে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বলে, চলে যাচ্চ কেন মা? নতুন দাদুর সঙ্গে [illegible] না? তার সঙ্গে কথা বলবে না।

সুমিত্রা কোন জবাব দেবার আগেই শিশির বলে, না, আমাদের এখন যেতে হবে!

যেতে হবে কেন? মিন্থু বলে, নতুন দাদু যে তোমাদের সঙ্গে ভাব করতেই এসেচে। আমি যে আসতে বলেছি—

হরিহর বলেন, ও তোমার নতুন দাদু নয়, ওই তোমার সত্যিকার দাদামশাই।

সত্যিকারের দাদামশাই?

বিস্ময়ে মিন্থু যেন কথা বলতে ভুলে যায়।...কিন্তু আমি যে...

সুমিত্রা এবার মিন্থুর একটা হাত ধরে ফেলে দৃঢ় পদে শিশিরের সঙ্গে এগিয়ে যায়। আর মিন্থু হল থেকে বেরিয়ে যাবার আগে করুণ-ভাবে একবার দাদুর মুখের দিকে চেয়ে নেয়।

রায়বাহাদুরের মনে হয় তার চোখের সামনে অন্ধকার একটা পর্দ্দা নেমে আসচে, আর শরীরের সেই পুরাণ যন্ত্রণাটা আবার যেন চাড়া দিয়ে উঠ্‌চে!

কয়েক দিন পরের কথা।

এই ক'দিন সুমিত্রা, শিশির আর হরিহরকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েচে—কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করতে। বাংলা দেশে শিশির আর থাকবে না, পশ্চিমে কোথাও গিয়ে প্র্যাকটিস করবে। হরিহর তো ক'দিন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পান নি ব'ললেই হয়। এদিকে সুমিত্রা আর শিশির নতুন গৃহস্থালী গড়ে তোলবার জন্য বসে বসে বুনছে—কল্পনার জাল। চারিদিকের এই উৎসাহ—উত্তেজনার মধ্যে শুধু মিনুর মুখেই হাসি নেই। এই ক'টা দিনের মধ্যেই তার বয়স যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে।

সেদিন সকালে মিনু চুপ করে সুমিত্রার ঘরের ভাঙা তক্তপোষটার ওপর বসেছিল। সুমিত্রা এসে খানিক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আজ একবার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসবে, মিনু? যাও না হরি-দার সঙ্গে—

—না, মা, দরকার নেই।

মিনু তক্তপোষ থেকে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা শিশিরের কাছে গিয়ে বলে, আমার সত্যি ওর জন্য ভাবনা হচ্চে, এমন মন-মরা ও কখনও ছিল না।

—পুরোণো জায়গা ছেড়ে যেতে হ'লে সকলেরই হয় ও রকম। নতুন

জায়গায় গেলেই বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে।—বলে শিশির একটা সিগারেট ধরায়।

সুমিত্রা একটু ইতস্তত: করে বলে, আমার কিন্তু মনে হয়, ও যেন কি একটা ভাবচে!

সুমিত্রার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে শিশির বলে, যা' ভাবচে তা' হবার নয় সুমিত্রা।

শিশির আর সেখানে দাঁড়ায় না।

সুমিত্রা মিনিটখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে যেন নিজের মনেই বলে, আমি জানি।

পশ্চিমে যাবার উদ্যোগপর্ব্ব হিসেবে হরিহর গিয়েছিলেন কতকগুলো জিনিসপত্র কিনতে। ফিরে এসে দেখেন ঘরের বাইরের দাওয়ায় মিনু বসে আছে একা, গালে হাত দিয়ে। তার দু'চোখে যেন যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা!

হরিহর জিজ্ঞাসা করেন, মিনু-দি এমন করে এখানে বসে যে?

মিনু বলে, এমনি।

খানিক চুপ করে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা হরি-দা, আমরা কি অনেকদূরে চলে যাব?

হরিহর বলেন, হাঁ দিদি, সে চমৎকার জায়গা। সেখানে তোমার বাবা কাজ করবেন কি না—সেখানেই ডাক্তারী করবেন—

এ খবর শুনেও কিন্তু মিনুর খুশী হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। খানিক চুপ করে থেকে সে আবার জিজ্ঞাসা করে, আর আমরা এখানে আসবো না?

—না দিদি, আর এ হতভাগা দেশে আসবো না।

হরিহরের ভাবটা রাগ না অভিমানের তা ঠিক বোঝা যায় না। মিনু আর কোন কথাই বলে না। কিন্তু তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে—সেটুকু হরিহর তাঁর ঝাপসা চোখের দৃষ্টি দিয়েও বুঝতে পারেন। মিনুর দুঃখটা কোথায় তা যেন আর তাঁর কাছে লুকোন থাকে না। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি একটু বিব্রতভাবেই ভিতরের দিকে পা বাড়িয়ে দেন।

মিনু আবার তেমনি করে বসে বসে ভাবে।

আজ কদিন দাদুর সঙ্গে তার দেখা হয় না। ঠিক ক'দিন হল?

...পাঁচ, ছয়, সাত, আট দিন। বাবা ফিরে আসার আগে সে রোজ একবার দাদুর কাছে যেত। এখন তিনি কি ভাবচেন কে জানে? হয়ত ভাবছেন বাবাকে পেয়ে মেয়েটা একেবারেই ভুলে গেল আমায়? হলেই বা তিনি সত্যিকারের দাদু, তিনি তার সঙ্গে একদিনও একটুকু খারাপ ব্যবহার করেন নি। তবে? বাবা আর মা-র সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল তা সে জানে না, কিন্তু সেদিন অমনি করে চলে আসা কি বাবার ভাল হয়েছিল? তিনি নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন, এই মেয়েটা তাঁর অপমান করবার জন্যই বাবা আর মাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা! দাদুর মনে এত বড় ভুল ধারণা থাকা কিছুতেই উচিত নয়। এখুনি সেটা ভেঙ্গে দেওয়া দরকার...

মিনুর আর কিছু ভাববার দরকার হয় না। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে সে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এক দৌড়ে গলিটা পার হয়ে ছুট...ছুট...

রাস্তায় ট্রাম বাস, গাড়ী ঘোড়া, মোটর, রিক্সার ভিড়—

লোকজনের অবিরাম যাতায়াত, কিন্তু সে সব দিকে কোন রকম ক্ষেপ না করেই মিনু ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছায়, একেবারে ায়বাহাদুরের বাড়ীর দরজায়।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে কিন্তু কি এক আশঙ্কায় মিনুর বুকের ভিতরটা ়প ঢিপ করতে থাকে। অন্যদিন নীচেতলায় এইখানটায় চাকর-ানসামাদের জটলা বসে, আজ কিন্তু কোনদিকেই কাউকে দেখা যায় না।

মিনু কি করবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবচে, এমন সময় একটা াকরকে সেইদিকেই আসতে দেখা যায়। মিনু প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে জ্ঞাসা করে, দাদু, নতুন দাদু কোথায়?

চাকরটা বলে, তাঁর তো অসুখ...

অসুখ, দাদুর অসুখ! মিনু ঠিক বুঝতে পেরেছিল, তা' নইলে তার ন এত খারাপ হয়েছিল কেন?

মিনু চাকরকে প্রায় অনুনয়ের স্বরে বলে, দাদু কোথায়, আমায় খিয়ে দাও না।

চাকরটা মিনুকে সঙ্গে করে সরকারের কাছে নিয়ে যায়। সরকার া গম্ভীর করে বলেন, তাঁর ভয়ানক অসুখ। কারও সেখানে যাবার ্কুম নেই।

কিন্তু মিনু সে হুকুম মানতে নারাজ। সে বলে, তা হোক। আমি বই।

অগত্যা সরকার মিনুকে রায়বাহাদুরের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে য়ে যান।

রায়বাহাদুর তখন খাটের উপর যন্ত্রণায় ছটফট করচেন। তিনি য় আছেন, কিন্তু মাথার দিকটা পর পর কয়েকটা বালিশ দিয়ে উঁচু র রাখা হয়েচে। নার্স শিশি থেকে গ্লাসে ওষুধ ঢেলে তাঁর মুখের

কাছে ধরে আছে, কিন্তু রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলচেন, না, না, ওষুধ আমার দরকার নেই। তুমি যাও...

রায়বাহাদুরের পুরানো চাকরটা গরমজলের ব্যাগটা সেঁক দেবার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে যেতেই রায়বাহাদুর সেটা তার হাত থেকে নিয়ে মেঝে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠেন, বলচি তোমরা এখান থেকে যাও, আমায় কারও কোন সেবা করতে হবে না।

মিনু মিনিটখানেক দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না। ঘরের ভিতর পা দিয়েই ডেকে ওঠে, দাদু...

বিস্মিত বিহ্বল রায়বাহাদুরের মুখের ভাবটা আশ্চর্য্য রকম বদলে যায়। তিনি সোজা হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই নার্স তাকে ধরে ফেলে।

মিনু এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে রায়বাহাদুরের বিছানার ওপর।

—দাদু...তোমার খুব কষ্ট হচ্চে দাদু? আমি হাত বুলিয়ে দেব?

—না দিদি, তুমি এসেছ, আর তো কোন কষ্ট নেই। কোন রকমে চোখের জল সামলে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তুমি কেমন করে এলে দিদি? কে তোমায় নিয়ে এলো?

—আমি নিজে একলা এসেছি!

একলা এসেছ? সে কি দিদি—মা বাবাকে না বলে?

—নইলে তারা যে আসতে দিত না। আমরা যে অনেকদূরে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, না এলে তোমায় যে দেখতে পেতাম না।

তাই তুমি পালিয়ে আমায় দেখতে এসেছ? এই পাষণ্ড বুড়োর ওপর তোমার এত টান?

মিন্থ একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তোমার ওপর

কণের এত রাগ দাদু ? কেন বাবা-মা তোমার সঙ্গে ভাব করতে য়ায় না ?

রায়বাহাদুর একটু ম্লান হেসে জবাব দেন, আমি যে ভারি খারাপ লোক দিদি।

মিনু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে, কই না তো। তুমি তো খুব ভাল।

— না, দিদি না, তুই জানিস না, আমি খুব খারাপ।

রায়বাহাদুরের মুখে আবার তেমনি ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

এদিকে ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর মেয়ের কোন সন্ধান না পেয়ে সুমিত্রা রীতিমত অস্থির হয়ে ওঠে।

হরিহর শুধু হেসে বলেন, ভাববার কিছু নেই ঠিক জায়গায় আছে।

কথাটা অনুমান করে নিতে শিশিরের খুব বেশী সময় লাগে না। ন উঠে দাঁড়িয়ে জামা পরতে সুরু করে।

সুমিত্রা বলে, কোথায় যাচ্ছ ?

—রায়বাহাদুরের বাড়ী।

—কেন ?

—মিনুকে ফিরিয়ে আনতে।

সুমিত্রা একবার ভাবে শিশিরকে মানা করবে, কিন্তু তার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে কোন কথাই বলতে পারে না। যে মানুষ কোন দিন সত্য আর অন্যায়ের সঙ্গে রফা করে চলতে শেখেনি তাকে সে নিষেধ করবে কি করে ?

খানিক চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলে, চলো আমিও যাব।

মিন্থুর সঙ্গে তখন রায়বাহাদুরের অনর্গল আলাপ চলছে।

—আচ্ছা দাদু, তুমি কি করে খারাপ হলে বলো না? তুমি বুঝি বড্ড রাগী?

—হ্যাঁ দিদি বড্ড রাগী। ছেলে বেলা থেকে কিছুতেই ওটাকে সামলে উঠতে পারি নি।

মিন্থু একটু চুপ করে থেকে বলে, আমি কিন্তু তোমায় ঠাণ্ডা করে রাখতে পারি দাদু।

—কি করে বলো ত দিদি?

—গল্প বলে, রূপকথা শুনিয়ে। তুমি দুধকুমারের গল্প শুনেছ দাদু, খুব ভাল গল্প। হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়—

রায়বাহাদুর কোন কথা বলবার আগেই বাইরে থেকে শিশিরের কণ্ঠ শোনা যায়, মিন্থু।

মিন্থুর মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে ছায়ার মত বিবর্ণ হয়ে যায়।

শিশির এসে ঘরে ঢোকে, পিছনে পিছনে সুমিত্রা। রায়বাহাদুরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই শিশির বলে ওঠে, মিন্থু এসো—

মিন্থু ভয়ে ভয়ে খাট থেকে নেমে অসহায় ভাবে শিশির আর সুমিত্রার মুখের দিকে তাকায় কিন্তু তারা দুজনেই নির্ব্বাক, নিশ্চল। মিন্থু এবার ফিরে তাকায় দাদুর দিকে। তাঁর তরফ থেকেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মিনিটখানেক সেই প্রকাণ্ড ঘরখানার মধ্যে শুধু

দেওয়াল ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ। তারপর মিন্থু বলে, দাদুর যে বড্ড অসুখ বাবা।

চোখের জল সে চেপে রাখতে পারে না।

শিশির এবার রায়বাহাদুরের খাটের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, তুমি চলে এসো এখুনি।

বাবার ওপর মিন্থুর ভীষণ রাগ হয়, কিন্তু তাঁর কথা অমান্য করবার সাহসও খুঁজে পায় না। শেষ পর্য্যন্ত রায়বাহাদুরের দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রায়বাহাদুর বলেন, না, লক্ষী দিদি তুমি যাও। বাবা-মার কথা শুনতে হয়।

মিন্থু মনে মনে আশা করেছিল, রায়বাহাদুর তাকে ধরে রাখবার জন্যে কিছু অন্ততঃ বলবেন। কিন্তু সে রকম কিছুই না ঘটায় মিন্থু যে কি করবে তাই ঠিক করতে পারে না। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার সে খাটের ওপর উঠে দাদুর কোল ঘেঁসে বসে পড়ে। তারপর বলে তোমার যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে দাদু, আমার যে যেতে ইচ্ছে করছে না।

মিন্থুর এতখানি কাতরতাও বোধ হয় শিশিরের অন্তর স্পর্শ করে না। মিন্থুর ওপর জোর কার বেশী বোধহয় সেইটাই পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করে, তোমায় কি তা হ'লে এইখানেই রেখে যাব মিন্থু?

মিন্থু অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে, কেন তোমরা দাদুর ওপর এত নিষ্ঠুর! দাদু তো খারাপ নয়, দাদু আমাকে এত ভালবাসেন, তোমাদেরও কত ভালবাসেন, তবু তোমরা তাঁকে এত অসুখের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্ছ? আমরা চলে গেলে দাদুকে কে দেখবে?

শিশির মেয়ের কথায় কি উত্তর দেবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না।

মিন্থ খাট থেকে নেমে এবার সোজা শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর কোথা থেকে সাহস খুঁজে পায় কে জানে, তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তুমি দাতুর অসুখ সারিয়ে দাও বাবা, দাতুর বড্ড কষ্ট হচ্ছে…

শিশির কোন কথাই বলতে পারে না, শুধু তার মনের মধ্যে এলোমেলো কতকগুলো প্রশ্ন জট পাকিয়ে ওঠে। আত্মীয় হিসেবে, মানুষ হিসেবে লোকটির প্রতি তার কোন রকম দুর্ব্বলতা এবং শ্রদ্ধা নেই একথা সত্যি, কিন্তু যে লোকটা অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় বিছানায় পড়ে ছটফট করচে ডাক্তার হিসেবে তাঁর প্রতি কি তার কোন কর্ত্তব্যই থাকতে পারে না ?

মিন্থর সেই অসহায় কাতর কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়,—বাবা !

শিশির ধীরে ধীরে রায়বাহাদুরের প্রকাণ্ড খাটখানার দিকে এগিয়ে যায়, পিছনে পিছনে মিন্থ। তারপর রায়বাহাদুরের মুখের দিকে না চেয়েই জিজ্ঞাসা করে, সেই আগেকার ব্যথা, কেমন ?

তার কণ্ঠস্বর রীতিমত রুক্ষ !

রায়বাহাদুর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়েন। অর্থাৎ শিশিরের ধারণা সত্যি।

শিশির এবার সুমিত্রার দিকে ফিরে তাকায়।

—যাও, হটওয়াটার ব্যাগটা আনো আগে।

হটওয়া টারের ব্যাগটা ঘরের মাঝখানেই গড়াগড়ি খাচ্ছিল এতক্ষণ। মিন্থই সেটা সুমিত্রাকে দেখিয়ে দেয়। সুমিত্রা সেটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিতেই শিশির রায়বাহাদুরকে বলে, নিন্, শুয়ে পড়ুন।

রায়বাহাদুর ছোট ছেলের মত ডাক্তারের হুকুমে নিঃশব্দে শুয়ে পড়েন।

হট্-ব্যাগটা জায়গা মত বসাতে বসাতে শিশির জিজ্ঞাসা করে, ক'দিন ধরে এরকম যন্ত্রণা ভোগ করচেন ?

রায়বাহাদুর বলেন, সেই মিন্নু-দিদির নাচের দিন থেকেই—

শিশির এবার একটু অপ্রস্তুত হয়েই প্রেসক্রিপশান লিখতে সুরু করে।

মিন্নু বলে, এবার তোমার সব অসুখ সেরে যাবে দাদু, দেখো। বাবা খুব ভাল ডাক্তার—না, মা ?

সুমিত্রা একটু লজ্জিত ভাবে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। রায়বাহাদুর একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বলেন, না সারলেও আর দুঃখ নেই দিদি, এখন মরতে পারলেই আমার সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

শিশির যেন ধমক দিয়ে উঠে, আচ্ছা চুপ করুন দেখি ! আপনার প্রায়শ্চিত্ত আমার দায় নয়, আপনাকে সারানই আমার কাজ।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলে, ওষুধ আমি দিচ্ছি, কিন্তু এখন এক বছর পুরো বিশ্রাম বুঝলেন !

রায়বাহাদুর বলেন, এক বছর !

—হ্যাঁ এক বছর। এর আর নড়চড় নেই।

শিশিরের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দেয় আর সেই সঙ্গে রায়বাহাদুরের সমস্ত দুশ্চিন্তাও যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়।

শিশির আর সুমিত্রার সঙ্গে হরিহরও এসেছিলেন মিন্নুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ; কিন্তু তিনি ভিতরে ঢোকেন নি, বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন। ভেবেছিলেন, কতক্ষণ আর লাগবে, শিশির ডাক্তার যাবে আর হাত ধরে মেয়েটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসা দূরে থাক, একটি ঘণ্টার পর যখন আরও মিনিট পনের কেটে গেল, তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে

থাকতে পারলেন না। চাদরটা একটু ভদ্রস্থ ভাবে কাঁধের ওপর ফেলে রায়বাহাদুরের বাড়ীর গেট পার হয়ে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। যেতে যেতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, না, মেয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও আসাই ঝকমারী। আজ রাত্রির ট্রেণেই সকলের কলকাতা ছেড়ে রওনা হবার কথা, এখনও বলতে গেলে সমস্ত কেনা কাটাই বাকী —বিদেশে গিয়ে বসবাস করা তো মুখের কথা নয়, অথচ এরা দুজনে সেই বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকেচে, বেরবার আর কথাটি নেই। কি কারণ হতে পারে কে জানে! বুড়োটার কোন অসুখ বিসুখ করেনিতো? তাই দেখে সুমিত্রা হয়ত সমস্ত রাগ অভিমান ভুলে বসে আছে। কিন্তু... শিশির? শিশির তো এত সহজে ভুলে যাবার লোক নয়। তা হলে...?

এই সব ভাবতে ভাবতে হরিহর কখন যে একেবারে বাড়ীর ভিতরে এসে পড়েছিলেন সেদিকে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। চমক ভাঙলো চাকরের চীৎকারে।

—আরে, আরে, কে আপনি—যাচ্ছেন কোথায়?

—যাচ্ছি তোমার পিণ্ডি দিতে। সরো....

হরিহর হন্ হন্ করে খানিকটা এগিয়ে চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের বাবুর ঘর কোনটা বলো দেখি বাবা?

চাকরটা হরিহরের ভাবভঙ্গী দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দেয়, উপরে। কিন্তু কারও যাবার হুকুম নেই।

হুকুম নেই! যেন চিরকাল তোদের হুকুম মেনেই চলাফেরা করলাম কি না।

চাকরটাকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি সোজা উপরে উঠে যান। তারপর রায়বাহাদুরের ঘরটা খুঁজে নিতে হরিহরের দেরী হয় না। কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে তিনি যেন রীতিমত অপ্রস্তুত

হয়ে পড়েন। রায়বাহাদুরের মাথার শিয়রে সুমিত্রা, পায়ের কাছে মিনু, আর সামনে একটা চেয়ারে বসে শিশির ডাক্তার। সকলের মুখে প্রসন্ন হাসি, দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধান এরা সওয়া ঘন্টার মধ্যেই পার হয়ে গেছে।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থেকে হরিহর বলে ওঠেন, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমে দুধে মিশে গেল, এখন আঁটি শুধু গড়াগড়ি যায়। কেমন!

ঘরশুদ্ধ সবাই একটু আশ্চর্য্য হয়েই হরিহরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মিনু ডাকে, হরিদা!

—বেশ আমি চল্লাম তা হ'লে। সেই কথাই বলতে এসেছিলাম। নিজের কথাগুলোই হরিহরের কানে কি রকম বেখাপ্পা শোনায়।

শিশির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। হরিহরের দিকে যেতে যেতে বলে, বাঃ তুমি চল্লে কোথায়?

হরিহর একটু ঝাঁঝালো ভাবে বলে ওঠেন, কেন, যাবার কোন চুলো কি আমার নেই? আর না থাকে তো নাই। তা বলে চিরকাল তোমাদের ব্যাগার খেটে মরবো! নিজের সংসার-ধর্ম্মের চেষ্টা আর আমায় করতে হবে না!

শিশির হাসতে হাসতে বলে, বেশ তো, তার জন্যে এখনও অঢেল সময় পড়ে রয়েছে। আপাততঃ তাড়াতাড়ি এই ওষুধটা তৈরী করিয়ে নিয়ে এসো দেখি।

প্রেসক্রিপশনটা শিশির হরিহরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। হরিহর উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠেন, ওষুধ তৈরী করিয়ে আনব!···না, না, ওসব পারবো না, আমি চললাম।

হরিহর সত্যি সত্যিই চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দেন। খাট থেকে নেমে এসে মিন্টু ডাকে, হরিদা!

—আর হরিদা কেন! মিন্টুর দিক থেকে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে হরিহর বলেন, এখন সত্যিকার দাদু পেয়েছ, হরিদা এখন কে?

গলার স্বরটা তাঁর ভাঙা ভাঙা মনে হয়।

রায়বাহাদুর সমস্ত ব্যাপারটা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝতে পারেন, ম্লান হেসে বলেন, না হরি তুমিই ওর আসল দাদু। আমার দাদুগিরির দাবী তো নিজের দোষে কবে তামাদি হয়ে গেছল। তুমি যত্ন করে বাঁচিয়ে না রাখলে, এ দাবী আমার কোথায় থাকতো? ওষুধ তোমায় আনতে হবে না; তুমি আমার কাছে এসে বস।

মিন্টু হরিহরের হাত ধরে টানাটানি সুরু করে দেয়, চলো হরি-দা, চলো…

খাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হরিহর বলেন, যাচ্ছি চল। কিন্তু এটা ভাল হল না দিদি। আমি তেতো পাঁচন অসুখের দিনে কাজে লেগেছি, কিন্তু আজ ভোজের দিনে পঞ্চ-ব্যঞ্জনের পাশে আমায় মানাবে কেন?

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বলেন, তুমি পাঁচন নয় হরি, তুমি পান। দুঃখের দিনে শুকনো ঠোঁট রাঙা করে রাখ, আবার ভোজের শেষে তুমি না থাকলে মুখশুদ্ধি হয় না।

মিন্টু হরিহরকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে খাটের এক প্রান্তে বসিয়ে দেয়। বিব্রত হরিহর হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে পারে না। খানিকক্ষণ বোকার মত বসে থেকে বলে ওঠেন, শুনলি দিদি শুনলি, কাজ বাগাতে বড় মানুষেরা কত মধুমাখা কথার ছলই না জানে! আমার মত আহাম্মুকেরা তাইতে ভুলেই চিরকাল এদের গোলাম হয়ে আছে।

শেষ